আত্মোন্নতি করিতে পারিয়াছিলাম বটে কিন্তু এখন আমরা যার পর নাই অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছি। হিন্দু যাহাকে উন্নতি বলে—যে উন্নতি হিন্দুর অভিপ্রেত আধুনিক শিক্ষায় তাহা কিছুতেই হইতে পারে না এবং সেইজন্য আমাদের দেশে এত অশান্তি, দেশীয় লোক এত ভ্রান্তমতি। ধর্ম্ম-ভিন্ন ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুজাতির উন্নতির আর অন্য উপায় নাই। এক্ষণে আমাদের সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে আবার ধর্ম্মের প্রসার প্রতিপত্তি, সমাজে ধর্ম্মকর্ম্মের বৃদ্ধি এবং লোকে স্বধর্ম্মে মতিমান হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করাই একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা হইলে আমাদের পূর্ব্ব গৌরব আবার ফিরিয়া আসিবে আমরা আবার সর্ব্বতোভাবে আত্মোন্নতি লাভ করিতে পারিব। হা ভগবান। সে দিন কি ফিরিয়া আসিবে? আবার কি আমরা যোগ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া ধর্ম্মময় জীবন অতিবাহিত করিতে পারিব? ভাই! আর কতকাল এইরূপে ধর্ম্মকর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া আর্য্যবংশে কলঙ্কের কালিমা লেপন করিবে। যদি আত্মোন্নতি করিবার বাসনা থাকে— যদি আবার প্রকৃত সুখের তরঙ্গে ভাসিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তোমাদের প্রাণপ্রিয় যোগ ধর্ম্মে পুনরায় মতি স্থির কর, দেখিবে এই জরামরণ সঙ্কুল ধরাই আবার তোমার চক্ষে ত্রিদিবের সুষমায় সুশোভিত হইবে, হে সাধক! তুমি ধন্য হইবে।

আং সং

হৃদয় ও মন।

সৌন্দর্য্যের উচ্চ্ছ্বাসময়ী, শোভার বিলাসভূমি, প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের নিগূঢ় নিয়মে আবদ্ধ। এক দিন যেখানে চারুকুসুমিত উপবন ছিল, সেখানে আজ তমসাময় বিশাল অরণ্য, এক দিন যেখানে তুষারমণ্ডিত তুঙ্গ শৈলরাজি বিরাজ করিত, সেখানে আজ গভীরগর্জ্জী ফেণাময় বিপুল সিন্ধু প্রমত্তভাবে ছুটিয়া যায়। রবি-শশি-তারকা-শোভিত আকাশের অনন্ত বিস্তৃতিও এ নিগূঢ় নিয়মের বশীভূত।

মনুষ্যের হৃদয় ও মন, বাহ্য প্রকৃতির ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল। মনুষ্যের জীবন শত ঘটনা-চক্রের মধ্য দিয়া যাইয়া যেন নূতন সংগঠিত হয়। সংসারের শোক চুল্লীতে শতবার দ্রবীকৃত হইয়া, উত্তপ্ত অশ্রুজলে শতবার মজ্জিত হইয়া, দুর্ভাগ্য-মুদ্গরে শতবার আহত হইয়া, অন্ধকারময় খনি-জাত ধাতুর ন্যায় মনুষ্য-জীবনকে জগতের ব্যবহারোপযোগী হইতে হয়। সেই পরিবর্ত্তন-শীল জীবনের সঙ্গে যে মনের ও হৃদয়ের, বুদ্ধির ও অনুভাবনার পরিবর্ত্তন হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি?

হৃদয় ও মন পরিবর্ত্তনশীল বলিয়াই, তাহা-দিগের উন্নতি ও অবনতি হইতে পারে। তাহারই জন্য মন ও হৃদয় শিক্ষার প্রভাবে সুন্দর ও পরিমার্জ্জিত হইতে পারে; ও শিক্ষার অভাবে মলিন ও হীনপ্রভ হইয়া যায়। ইহারই জন্য জগতে মনের ও হৃদয়ের নিয়মিত শিক্ষা ও পরিমার্জ্জন প্রয়োজনীয়।

যেমন কতকগুলি সত্য আছে, যাহাকে প্রকৃতিস্থ মনমাত্রেই বিশ্বাস করিবে, তেমনি জগতে কতকগুলি সুন্দর পদার্থ আছে, যাহাকে

প্রকৃতিস্থ হৃদয়মাত্রেই ভালবাসিবে। কিন্তু কঠিন সত্য হইলে যেমন কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি অসত্য, বুঝাইতে একজন বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান গুরুর আবশ্যক করে, তেমনি কখন কখন কোন্‌টী সুন্দর, কোনটি অসুন্দর. ইহা বুঝাইতে একজন প্রেমী ও কবির সহায়তার প্রয়োজন। অশিক্ষিত হইলেও মন আপন প্রকৃতি হইতে প্রায়ই এত দূরবর্ত্তী হয় না, যে সামান্য সত্য বিশ্বাস করিতে পারে না। ঊর্দ্ধে প্রক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড যে পুনর্ব্বার ভূপতিত হয়, এ জলন্ত সত্য কে না স্বীকার করিবে? তেমনি অশিক্ষিত হৃদয়ও জীবন্ত সৌন্দর্য্যকে অসুন্দর ভাবিতে পারে না। পূর্ণিমা নিশীথিনীর শান্ত জ্যোৎস্না প্রাতঃসবিতার দীপ্ত প্রসন্নতা ও স্নিগ্ধতা, গোলাপ কুসুমদলের মাধুর্য্য কয়জন না স্বীকার করিবে? মনুষ্যের প্রকৃতি—জ্ঞান ও প্রেম। মন স্বভাবতঃই বিশ্বাস করিতে চায়, ও হৃদয় স্বভাবতঃই ভালবাসিতে চায়। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম, অন্তর্জগতের চিরন্তন স্বভাব। কিন্তু যেখানে সত্য ও সৌন্দর্য্য বোধ হওয়া দুরূহ, যেখানে সত্য ও অসত্যের মধ্যে, সৌন্দর্য্য ও অসৌন্দর্য্যের মধ্যে ক্ষীণ রেখাপাত করিতে হইবে, সেখানে একজন বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী, প্রেমী ও কবির সহায়তার প্রয়োজন।

জগতে মনের শিক্ষা আকাঙ্ক্ষিত পরিমাণে হইলেও হৃদয়ের শিক্ষা হয় না। তাহারই জন্য সংসারে এত কোলাহল ও অরাজকতা, হিংসা ও কৃতঘ্নতা ক্রোধ ও অপ্রেম। তাই মনুষ্যের এ সুন্দর সংসার আজ কণ্টকাবৃত অরণ্যের ন্যায়, বাত্যাসংক্ষুব্ধ, ঘূর্ণমান উন্মত্ত জলধরের ন্যায়, সাহারার অনন্তবর্ত্তী, দিগন্তপ্রসারী মরুভূমির ন্যায়, সাধুর ও প্রেমীর, উদারচেতার ও কবির বাসযোগ্য স্থান নহে। তাই তাহাদিগের মাঝে মাঝে সংসার ছাড়িয়া যাইতে বাসনা হয়; অরণ্যের নির্জ্জন প্রদেশে বাস করিতে অভিলাষ হয়।

আমি জানি, বিজ্ঞান উচ্চ, বিজ্ঞান মহৎ। বিজ্ঞান না থাকিলে, এ বিশ্বজগৎ এক অনন্ত কোলাহল; বিজ্ঞানের সহায়তায় ইহা অনন্তপ্রসারী এক সমতান মহাসঙ্গীত। পূর্ব্বে যেন গ্রহ তারা, রবি সুধাংশু অনিয়মিত-মার্গে, উদ্দেশ্যহীন পথভ্রষ্ট উল্কার ন্যায় আকাশে বিচরণ করিতেছিল, এখন বিজ্ঞানের কুহক-দণ্ডের আজ্ঞায় তাহারা নির্দ্দিষ্ট পথে, নির্দ্দিষ্ট গতিতে, অনন্ত বিশ্রান্ত মধুর সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে আকাশে ঘুরিতেছে। বিজ্ঞান-সহায়তায়, বিমান-রথ গর্ব্বে মেঘাশ্লিষ্ট গগনে বিহার করে, বাষ্পীয় যান সদর্পে মহীতলে বিচরণ করে। বিজ্ঞান-বলে দুর্ভেদ্য নির্জ্জন অরণ্য আজ কোলাহলপূর্ণ রাজপুরী, ঝঞ্জাকুল আবর্ত্তময় সিন্ধু আজ মনুষ্যের পদদলিত। তাই বলি, বিজ্ঞান মহৎ ও উচ্চ। বিজ্ঞান মানবের মহীয়সী কীর্ত্তি. প্রতিভার আশ্চর্য্য বিকাশ, সভ্যতার গৌরবময় ফল। ভাস্কর ও আরিষ্টটল, গ্যালিলিও ও কেপলার, লাপ্‌লাস ও নিউটন মনুষ্যের গৌরব, জগতের আরাধ্য দেবতা।

কিন্তু তাই বলিয়া কি হৃদয়ের উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন বিস্মৃত হইব? হৃদয়ের শোচনীয় অন্ধকার ভুলিয়া যাইব? বিজ্ঞান মহৎ বটে, কিন্তু বিশ্ব-প্রেম মহত্তর! বিজ্ঞান আমাদিগের পার্থিব ও ভৌতিক সুখের ও আরামের নিদান; বিশ্বপ্রেম আত্মার স্বর্গীয় উচ্চ প্রীতি ও শান্তির আধার। ইহারই অভাবে আজ সংসারে এত কোলাহল, এত দ্বন্দ্ব। প্রতি হৃদয়ের প্রকৃত

শিক্ষা হইলে, প্রতি হৃদয় সুন্দর হইলেও সৌন্দর্য্য বুঝিলে, কি সংসার এক অনন্ত প্রেম-সিন্ধুতে পরিণত হইবে না ?

আমি স্বীকার করি যে প্রতি হৃদয় সুন্দর হইলে ও প্রতি মনুষ্যের বহিরাকার সুন্দর হইতে পারে না। তবে কি প্রকারে মনুষ্যে মনুষ্যে প্রেম হইবে ? আমি বলি যে, হৃদয়ের সৌন্দর্য্য দেহসৌন্দর্য্য হইতে অধিক আকর্ষণীয় মুহূর্ত্তের জন্য বহিঃসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলেও হৃদয়ের অসৌন্দর্য্যে—এ মোহ, এ প্রীতি—মেঘস্থ চপলার ন্যায়, প্রভাতের সুখস্বপ্নের ন্যায়, সন্ধ্যার আন্দোলিত স্মৃতির ন্যায়, ক্ষণিক ও মুহূর্ত্তস্থায়ী। কিন্তু হৃদয়ের সৌন্দর্য্যজাত, আনন্দরঞ্জিতমেঘ-প্রতিভাত হৃদয় প্রশান্ত হ্রদের ন্যায়, প্রভাতের সূর্য্যকরসহিত সংসারের ন্যায়, পূর্ণচন্দ্রমার শান্ত কিরণের ন্যায় স্থির ও নিশ্চল। যে হৃদয় সুন্দর, যাহা প্রীতি, শান্তি, পবিত্রতার আবাসভূমি, সে হৃদয়কে কয় জন ভাল না বাসিবে ? রমোলাতে (Romola) সুখে লালিতা রমোলা ও পথিক টাইটো (Tito) উভয়েই সুন্দর। কিন্তু তাহাদিগের প্রেম কয় দিন স্থায়ী হইয়াছিল ? আবার আডাম বিডে (Adam Bede) আডাম প্রথমে সুন্দরী হতভাগিনী হেটিকে ভাল বাসিলেও পরিশেষে স্বর্গীয় জ্যোতিঃপূর্ণহৃদয়া কোমলা নাতিসুন্দরী ডাইনাকে (Dina) যথার্থ ভাল বাসিয়াছিলেন। ডাইনাও আডাম নাতিসুন্দর হইলেও তাহার হৃদয়সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সে প্রেমের প্রতিদান করিয়াছিলেন। তাই বুঝি, হৃদয়সৌন্দর্য্যই যথার্থ সৌন্দর্য্য। কিন্তু তাই বলিয়া বলি না যে, বহিঃসৌন্দর্য্য মুগ্ধ করে না। নির্জ্জীব জগতে সুকুমার শশী, মৃদুভাষী তরঙ্গিণী, শ্যাম প্রান্তর, প্রভৃতির হৃদয় নাই ; কিন্তু প্রকৃত কবি তাহাদিগকে সহৃদয়া নারীর ন্যায় ভাল বাসেন। কিন্তু হৃদয়বান্ মানুষের, হৃদয়ের অসৌন্দর্য্যে বহিঃসৌন্দর্য্য মুগ্ধ করে না।

জগতে হৃদয়ের শিক্ষা হয় না। তাহারই জন্য মানুষ এত দুঃখী। তাই সে সংসারের পীড়নে অবসন্ন হইয়া পড়ে। যথার্থ সৌন্দর্য্য প্রাণের সহিত ভাল বাসিতে পারিলে সে এত অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিত না। প্রকৃতি সৌন্দর্য্যময়ী। তাহাকে ভাল বাসিলে আবার কিসের দুঃখ। সে "আমারই এ নিখিল ভুবন" মনে করিয়া সকল দুঃখ ভুলিয়া যাইত। কর্ম্মশ্রান্ত ও সঙ্গিত্যক্ত শরীর ও মনের প্রকৃতিই ঔষধ ও প্রতিকার *। সন্ধ্যার দূরপ্রসারী প্রান্তরের দৃশ্য, মহী-আলিঙ্গিত নীলাকাশ সিন্ধু, মগ্নপ্রায় রবি-করের কনকলহরী, কোমল মধুর নবরঞ্জিত মেঘমালা তরণী,—এ দৃশ্য কোন্ দুঃখ কোন্ যন্ত্রণা দূর না করিবে। শিক্ষিত হৃদয়ের এ শোভা বুঝিতে সেলির বা কালিদাসের প্রয়োজন নাই।

কবি কে ? কবি সৌন্দর্য্যের শিক্ষাদাতা। প্রেমী আপনিই ভালবাসেন, কবি নিজে ভাল বাসিয়া জগৎকে ভালবাসা শিক্ষা দেন। কি সুন্দর, কি অসুন্দর, ইহাই তিনি মধুর ভাবে বুঝাইয়া দেন। সেক্সপীয়র ও কালিদাস কবি ; কারণ তাঁহারা জগতে সৌন্দর্য্যসাগর মথিত করিয়াছেন। সেক্সপীয়র সৌন্দর্য্যের সহিত অসৌন্দর্য্যের ছবি আঁকিয়া সৌন্দর্য্যকে আরও

* To the body and mind which have been cramped by noxious work or company, nature is medecinal and restores their tone

—*Emerson's Nature, III, Beauty.*

পরিস্ফুট করিয়াছেন ; কালিদাস শুদ্ধ সৌন্দর্য্যই তাঁহার অনুপম তূলিকায় চিত্রিত করিয়াছেন। উভয়েই মহান্ কবি ও গুরু। উঁহারা হৃদয়-রাজ্যের গ্যালিলিও ও ভাস্কর, কম্‌ট্ ও গৌতম। উঁহারা তাঁহাদের ন্যায় মনুষ্যের পূজ্য ; উঁহারা মনুষ্যজাতির অলঙ্কার, জগতের গৌরব বিশ্বের শিক্ষাদাতা। আমরা তাঁহাদিগের নিকট সৌন্দর্য্যতত্ত্ব শিক্ষা করিব।

তবে তাঁহাদিগের শিক্ষক কে? যে আরিষ্টটল ও নিউটনের শিক্ষক,সেই দয়াময়ী প্রকৃতিই তাঁহাদিগের গুরু। প্রকৃতিই তাঁহাদিগের নিকট, তাঁহার উপাসকমণ্ডলীর নিকট, নিত্য সত্য সৌন্দর্য্যপ্রদর্শনী। নিউটন ও সেক্ষপীয়রের ন্যায় প্রতিভাশালী দেবতার, প্রকৃতির নিকট শিক্ষা হয় ; কিন্তু আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র মনুষ্যের শিক্ষার নিমিত্ত নিউটন ও সেক্ষপীয়রের সহায়তা চাই।

কার্লাইল বলেন যে, জাতির নব অভ্যুত্থান সময়ে এক জন অবতার-স্বরূপ জন্মিয়া প্রকৃতি তত্ত্ব বুঝাইয়া দেন,তাহাতেই জাতীয় অভ্যুত্থান। সকল জাতি প্রথমে আপন ভাবে চিন্তা করে। তাহার মন প্রথমে কতক সত্য ও বহু অসত্য বিশ্বাস করে। সেই অসত্যে বিশ্বাসের অপনয়নের জন্য জ্ঞানী অবতারের জন্ম। তেমনি সেই আদিম অবস্থায় জাতি কতক বাস্তবিক সৌন্দর্য্য, কতক অসৌন্দর্য্য ভাল বাসে। ইহারই জন্য এখনও বিভিন্ন জাতির মধ্যে সৌন্দর্য্যের বিভিন্ন অনুভব শক্তি। ইহারই জন্য চীনবাসী, আফ্রিকাবাসী, ইউরোপবাসীদিগের সৌন্দর্য্যের বিভিন্ন ধারণা। সেই সৌন্দর্য্যকে সৌন্দর্য্য হইতে পৃথক্ করিবার জন্য কবি ও প্রেমী অবতারের জন্ম। সকলেই হোমর ও আরিষ্টটল হইতে পারে না ; উঁহারা উপাস্য দেবতা ; উঁহারা জগতের শিক্ষক। আমরা উঁহাদিগের শিষ্য।

পূর্ণ সৌন্দর্য্যই ঈশ্বর। যিনি পূর্ণসৌন্দর্য্য বুঝাইতে পারেন, তিনি প্রেমসন্ন্যাসী। ঈশা, চৈতন্য এই ধর্ম্মের প্রচারক। সেক্ষপীয়র কালিদাস উচ্চ, কিন্তু ঈশা চৈতন্য উচ্চতর। পূর্ণসৌন্দর্য্য মনুষ্যের অগম্য, বোধের অতীত। ইহা পূর্ণশশীর ন্যায় মধুর, মানুষ তাহার নিকটে যাইতে চায়, কিন্তু বিফল হয়। যে যত দূর নিকটে যাইতে পারে, সে তত দূর উচ্চ। যে পূর্ণপ্রেম প্রচার করে, সেই মহৎ, সেই দেবতা। হিউম ও বেন্থামের সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম জগতে থাকিতে পারে না। সে পার্থিব ধর্ম্ম রক্ত-মাংসহীন অস্থির ন্যায় কঠিন ও জীবনহীন। হৃদয় শিক্ষিত হইলে, এ ধর্ম্ম দূরে পলায়ন করিবে। নূতন হৃদয়ের, ধর্ম্ম জগতকে আলিঙ্গন করিবে। মন ও হৃদয়ের বুদ্ধি ও অনুভাবনার উভয়ের রাজ্যের সীমা নির্দ্ধারিত হইবে।

পুরুষ রমণীর কোমল সঙ্কীর্ণ প্রেম এই উচ্চ পূর্ণ প্রেমের প্রথম সোপান। তাহাদের প্রেমে, আত্মার পরিণয়ে এই সুখময় ফল উৎপন্ন হয়। যদি না হয়, তবে পরিণয় যথার্থ ফলপ্রদ নহে। সাধারণের ধারণা অপেক্ষা পরিণয়ের উচ্চতর উদ্দেশ্য আছে। স্বামী স্ত্রীর হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন না হইলে, যে উদ্দেশ্য সংসাধিত হয় না। হৃদয়ের মিলনের নিমিত্ত সমাজে অন্য প্রকার বিধির প্রয়োজন। হৃদয়ের বিনা মিলনে পরিণয় পরিণয়ই নহে। পরিণয়ের ঈপ্সিত ফল কেবল সন্তান নহে ; ইহার অভিলষিত উদ্দেশ্য হৃদয়ের শিক্ষা।

পুরুষ রমণী বিবাহিত হইয়া সৌন্দর্য্যতত্ত্ব শিক্ষা করিবে, পরস্পরের সৌন্দর্য্য পরস্পর ভাল বাসিয়া পরে হৃদয়কে আরও শিক্ষিত করিয়া বিশ্বের সৌন্দর্য্য ভালবাসিতে শিখিবে; পরে ঈশ্বরকে ভাল বাসিবে। এই প্রেম তাহার গম্য স্থান। এ প্রেম নির্ম্মল, স্থির, পবিত্র। এ প্রেম অনন্ত সুখময়, হৃদয়োন্মাদিনী। এই প্রেমোন্মত্ত হইয়া চৈতন্য তরঙ্গিনী-হৃদয় প্রতিভাত চন্দ্রমার শতধীকৃত মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। সে প্রেমের বিষয় লেখনী আর কি কহিবে। লেখনী স্থির হউক। আইস অনন্ত নীরবতা, তাহা সভক্তি বিস্ময়ে ধ্যান করি।

শ্রীদ্বিজেন্দ্র লাল রায়।

হিন্দুর গৃহস্থালী ও হিন্দুত্ব।

হিন্দুর জীবন ধর্ম্মময়। ধর্ম্ম ছাড়া যাহা কিছু তাহা হিন্দুর করণীয় নহে, করিলে তাহাতে হিন্দুত্বের হানি হইয়া থাকে। যে সকল বিষয় ধর্ম্মের সহিত জড়িত নহে, যাহার ভিত্তি ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহা হিন্দু আপনার বলিয়া লইতে পারে না। চতুর্ব্বিধ আশ্রমের মধ্যে হিন্দু যে আশ্রমেরই অন্তর্ভুক্ত হউক না কেন, ধর্ম্মের সহিত তাঁহাকে বিজড়িত থাকিতেই হইবে, তাহার প্রত্যেক বিষয় ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া কাজ করিতে হইবে। ইহাই হিন্দুত্ব এবং এইরূপ কার্য্যই হিন্দুর করণীয়। ছাত্রের গুরুগৃহে অধ্যয়নের জন্য তপস্যা করিতে হয়। ছাত্রের অধ্যয়নই তপস্যা।

হিন্দুর প্রথম আশ্রম ব্রহ্মচর্য্য—ইহাই ধর্ম্মশিক্ষার প্রথমাবস্থা, শারীরিক ও মানসিক শক্তির বিকাশ ইহাতে হয়। তৎপরে গৃহী, পরীক্ষার সহিত ধর্ম্মশিক্ষা এবং তাহাতে দৃঢ় আস্থাবান্ হইতে শিক্ষা করাই দ্বিতীয় অবস্থা; বানপ্রস্থ ধর্ম্মশিক্ষার পরিপক্কাবস্থা, শেষ পতিবিধি-বিমোচিত অবস্থা—"যোতি"।

আজ আমরা গৃহাশ্রম বা হিন্দুর গৃহস্থালীর বিষয়ই কথঞ্চিৎ বলিব—ইহাই আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে কঠিন। কার্য্য করিতে পারিলে অর্থাৎ এই আশ্রমের ভীষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, ভোগ, মোক্ষ করতল-গত করিতে পারা যায়, পূর্ব্বে আর্য্য-মনীষীগণ নারদ, শুকদেব প্রভৃতি কয়েকজন ব্যতীত সকলেই এই সংসার আশ্রমে থাকিয়াই আত্মোন্নতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুর গৃহস্থালী এক অপূর্ব্ব সামগ্রী। ইহা দেবতারও বাঞ্ছনীয়, কিন্তু হায়! হিন্দুর সে ধর্ম্মময় সংসার, হিন্দুর সে পবিত্র গৃহশোভা, সে সুন্দর গৃহস্থালী আর নয়ন গোচর হয় না। আছে সব, কিন্তু সে কমনীয়তা নাই; সে ধর্ম্মভাব নাই। ধর্ম্মের দ্বারা যাহা সজ্জিত, তাহা দেখিলে কাহার প্রাণে না আনন্দ হইবে, কিন্তু আজকালকার সংসার, দেখিলে প্রায়ই সে পবিত্র, সে মধুময় ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না, যেন কি এক বিশৃঙ্খল ভাবে বিশৃঙ্খলতায় পূর্ণ হইয়াছে। প্রতিমা আছে প্রাণপ্রতিষ্ঠা অভাবে তাহা ঔজ্জ্বল্যবিহীন হইয়াছে। ধর্ম্ম ভিন্ন ত উজ্জ্বলতা রাখার অন্য উপায় নাই, ধর্ম্মই যে ভাবের দীপ্তি, ধর্ম্মই যে প্রকাশক। কিন্তু প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে কে? প্রকৃত প্রতিষ্ঠাপন্ন গৃহী কই? গৃহী নাই বলিয়াই হিন্দুর গৃহস্থালীর এত দুর্দ্দশা হইয়াছে। মালী থাকা না হইলে কি বাগান সাজাইতে

পারে? হিন্দুর একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা গৃহস্থালীর একটী সুশোভন দৃশ্য, এখন সে প্রথা ত নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

হিন্দুর গৃহস্থালীটি সাজাইতে হইলে প্রথমতঃ সুন্দর বাসস্থান গৃহ, দেবারাধনার স্থান, তুলসী মঞ্চ, গো-শালা, অতিথী সেবা, পতিব্রতা ভার্য্যা, বশবর্ত্তী পুত্র, থাকা চাই—ইহাই সাজাইবার প্রধান উপাদান। ইহা না হইলে সে গৃহ হিন্দুর গৃহ বলিয়া পরিগণিত হইবে না। কিন্তু আজকাল এ সকলের কয়টী হিন্দুর গৃহস্থালীতে পাওয়া যায়? হিন্দু আজকাল আর হিন্দুর মত গৃহস্থালী নির্ম্মাণ করে না। হিন্দুর গৃহস্থালী পূর্ব্বোক্ত উপাদানে গঠিত না হইলে হিন্দুর শাস্ত্রানুসারে তাহা শ্মশান ভূমি, হিন্দুর বাসের অযোগ্য। আজকাল কয়জন তাহা ভাবিয়া চণ্ডিমণ্ডপ বা ঠাকুরদালান রাখিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করেন, আজকালকার বাসগৃহ নির্ম্মাণ ত পাশ্চাত্য ধরণেই হইয়া থাকে। নানা সুজাতীয় বৃক্ষ গৃহের চারিধারে রোপণ করা হিন্দুর কর্ত্তব্য। অভাবে গৃহে তুলসী-মঞ্চ রাখা একান্ত উচিত। ইহাতে স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। গরুর ন্যায় নিত্য আবশ্যকীয় মাতৃ-মূর্ত্তি, যাহার কিছুমাত্র অপবিত্রতা নাই; যাহার বিষ্ঠা মূত্রেও হিন্দু গৃহীর সমধিক আদর। মাতা আর গোমাতা জীবন-রক্ষয়েত্রী—ইহার প্রতিষ্ঠা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। ইহাতে গৃহের পবিত্রতা ও ম্যালেরিয়াদি ব্যাধী বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অন্ততঃ এক জনকে আহার করাইয়া তবে নিজে আহার করা—ইহা হিন্দু-গৃহীর কর্ত্তব্য, অভাবে মুষ্টি ভিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা আছে। পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী হিন্দু-গৃহের পবিত্র-কারিণী ধাত্রী ইহারা এখন ধাত্রীরূপে কতকটা আছেন বলিয়াই হিন্দুর নাম এখন লোপ হয় নাই। হিন্দুর গৃহিণীরাই এখনও হিন্দুর নাম মাত্র বজায় রাখিয়াছেন।

কামিনী ও কাঞ্চন তপস্যার অন্তরায়। জ্ঞানী সাধক ইহার দ্বারা কিছুতেই অভিভূত হইতে চাহেন না। কিন্তু এই সংসারাশ্রমে থাকিয়া তপস্যা করিতে হইলে তোমাকে এই তপস্যার ঘোর বিরোধী বস্তু "কামিনী-কাঞ্চন লইয়া অহরহ বিজড়িত থাকিতে হইবে। এই সকল ঘোর প্রলোভন, ভীষণ পরীক্ষা-লিপ্ত থাকিয়া তোমাকে সংসারে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে হইবে—তাহা হইলেই ইহা সহজেই বিবেচ্য যে সংসারাশ্রম অতীব কঠিন, এবং এখানে থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ করা বড়ই ভয়ানক ব্যাপার। তাই সংযমী না হইলে, প্রকৃত দৃঢ়ব্রত না হইলে এ পথে তাহার পদস্খলন অবশ্যম্ভাবী। এই জন্য ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা করিয়া শারীরিক ও মানসিক শক্তি, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সম্যক বিকশিত হইলে, তবে গৃহী হইতে হয়। সংসারাশ্রমই ধর্ম্মশিক্ষার প্রকৃত স্থান, তাই ব্রহ্মচর্য্যে প্রকৃত পারদর্শি হইলে তবে গৃহী এ আশ্রমকে ঠিক নিজের মত ধর্ম্ম আলোচনার আদর্শ স্থান করিয়া গৃহস্থালী নির্ম্মাণ করিয়া লইতে পারে। হিন্দু গৃহস্থালীর যে দিকে চাহিবে—সেই দিকেই তুমি ধর্ম্মের উজ্জ্বল প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া ধন্য হইবে—হিন্দুর সংসার ধর্ম্মময়—তাই ইহা—সংসার-ধর্ম্ম বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে। নারীজাতি এক দিকে যেমন ধর্ম্মসাধনার অন্তরায়, অপরদিকে তেমনি ধর্ম্মসাধনার প্রধান সহায়। গৃহী ব্যক্তি ইহাদের দ্বারা ধর্ম্মসাধনার বিশেষ সাহায্য লাভ করিতে পারেন—এইজন্য শাস্ত্রে এরূপ বশবর্ত্তিনী স্ত্রীকে সহধর্ম্মিনী আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। হিন্দুর

গৃহস্থালীর মধ্যে পতিব্রতা ভার্য্যা অতীব শোভনীয় পদার্থ—ইহা ব্যতিরেকে হিন্দু-গৃহের শোভা হইতেই পারে না। এইজন্য শাস্ত্রকারগণ মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন—"পত্নীমূলং গৃহং পুষাং যদি ছন্দানুবর্ত্তিনী। গৃহাশ্রমাৎ পরং নাস্তি যদি ভার্য্যা বশানুগা।"

অতএব প্রিয় বাদিনী সহধর্ম্মিণী সংসারী তপস্বীর পক্ষে প্রতিকূলাচারিণী নহে। বরং সকল প্রকারেই গৃহীর মঙ্গল বিধান-কর্ত্রী, হিন্দুর পবিত্র গৃহের আলোক স্বরূপিণী, দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণ সমূহের জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি—এই দেবী স্বরূপিণী রমণী মূর্ত্তি না থাকিলে হিন্দুর সংসার এরূপ পবিত্রতার আধার ভূত হইত না। এক কথায় ভগবতীর আনন্দময়ী মূর্ত্তি রমণীরত্নই হিন্দু সংসারের সার রত্ন—হিন্দু গৃহস্থালী সাজাইবার প্রধান ও প্রকৃষ্ট উপাদান। তাবপর পুত্রকলত্রাদি—ইহারা না থাকিলে সংসারে কোন সুখই থাকে না—তবে পুত্র কলত্রাদি পিতামাতার বশবর্ত্তী ও ধর্ম্মপথগামী হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য, নতুবা শান্তির পবিবর্ত্তে অশান্তির অনল ধূ ধূ প্রজ্জ্বলিত হইয়া অচিরে সংসার ছারখার করিয়া ফেলিবে। বংশে একটী সৎপুত্র জন্মগ্রহণ করিলে তাহার পূর্ব্বতন চৌদ্দ পুরুষ আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, এই সৎ পুত্রের দ্বারা বংশের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু আজকাল এরূপ পুত্র কন্যা কয়টী সংসারে দেখিতে পাওয়া যায়? দেখিতে যে পাওয়া যায় না—সে দোষ আর কাহার নহে—পিতা মাতার। অজ্ঞ জননী দ্বারা সৎশিক্ষা প্রাপ্ত না হইয়াই পুত্রগণ বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া অনাচারী হইতেছে; হিন্দু নাম লোপ করিতেছে। আজকাল অশন বসনেও হিন্দু গৃহস্থালীর ও হিন্দুত্বের ঘোরতর অনিষ্ট হইতেছে। এখন শাস্ত্র বিহীত আহারাদির প্রতি আর হিন্দুর তত আস্থা নাই। এখন যাহার যাহা ইচ্ছা—তিনি তাহাই খাইতেছেন, যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছেন। এই অশন বসনেও অনেক সময়ে হিন্দুর ছেলেকে হিন্দু বলিয়া চিনিতে পারা যায় না, যেন কি এক প্রকার আসুরিক ভাব আসিয়া সে সাত্ত্বিক প্রকৃতি, হবিষ্যান্নভোজী হিন্দুর হিন্দুত্ব নাশ করিয়া ফেলিতেছে। আহারের সহিত ও পোষাক পরিচ্ছদের সহিত ধর্ম্মাচরণের অনেক নৈকট্য সম্বন্ধ বিদ্যমান হইয়াছে, শাস্ত্রানুমোদিত অশন বসনের বিরুদ্ধাচরণ করিলে হিন্দুর যে হিন্দুয়ানী বা হিন্দুত্ব থাকে না—সকল দিকে তাহার অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, আজকালকার অনাচারী হিন্দুর দৃষ্টান্ত দেখিলে তাহা সম্যক প্রকারে প্রতীয়মান হইবে। ক্রমশঃ—আঃ সং

বকরীদ।

ইহা মুসলমানদিগের একটী পর্ব্ব বা ধর্ম্মানুষ্ঠান। এই পর্ব্বদিনে মুসলমানদিগকে গো-হত্যা করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে হয়—ইহাই বকরীদের উদ্দেশ্য।

গাভী হিন্দুর নিকট পরম পবিত্র জন্তু, হিন্দু গাভীকে জননীর ন্যায় মান্য করে, দেবতার ন্যায় পূজা করিয়া ধন্য হয়, এই হেতু গো-হত্যা হিন্দুর নিকট সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য, এমন কি "গোহত্যা" উচ্চারণ করিলেও হিন্দু আপন রসনাকে কলুষিত মনে করেন। যে এই গো-হত্যা করে, হিন্দুর নিকট তাহার তুল্য ঘৃণ্য আর কেহই নাহি। হিন্দুর নিকট গো-হত্যা-

কারীর আদর নাই। গো-হত্যাকারীকে তাহারা পতিত বলিয়া জানে, তাই তাহাদের সহিত সদ্ভাবে হিন্দু মিশিতে বা ধর্মকর্ম করিতে পারে না। এইজন্য সেদিন বকরীদে গরু কোরবানী লইয়া হিন্দু মুসলমানে বিষম লোমহর্ষণ বিপ্লব সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। সে ভীষণ কাণ্ড লইয়া কলিকাতার ন্যায় রাজধানীর কাজকর্ম প্রায় অষ্টাহকাল বন্ধ ছিল। কত লুট তরাজ, কত বীভৎস কাণ্ড যে সেদিন খাস কলিকাতা সহরে, পুলিশের সম্মুখে, হিন্দু মুসলমানের দ্বারা সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, তাহা লেখনী দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। এই লোমহর্ষণ ঘটনা যে দেখিয়াছে সেই বুঝিয়াছে—ধর্ম্ম-বিপ্লব কিরূপ ভয়ানক এবং তাহার দ্বারা কিরূপ অনিষ্টপাত হইতে পারে, আজ সাধারণে তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছে। স্তম্ভিত ও মর্ম্মাহত হইবার বিশেষ কারণ এই যে খাস কলিকাতা সহরে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী বৃটিশ কেশরীর শাসনাধীন ভারতের রাজধানী মহানগরী কলিকাতার বক্ষস্থলে, যথায় বড়লাট, ছোটলাট, জঙ্গীলাট, পুলীস কমিশনার এবং এমন ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ পর্য্যন্ত বিরাজিত, এমন সুরক্ষিত রাজধানীর মধ্যে দিবাভাগের প্রখর মধ্যাহ্ন সময়ে, পুলীশপ্রহরীর চক্ষের সম্মুখে নিরীহ রাজভক্ত প্রজার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইল, দোকানপাট লুট হইল, কত লোক হতাহত হইল, আরও কত বিভৎস কাণ্ড সংঘটিত হইয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে কলিকাতায় আর কখন কেহ এরূপ লোমহর্ষণ, বিভৎস কাণ্ড, অবাধে সংঘটিত হইতে দেখে নাই। ইহা স্বপ্নেরও অতীত, কল্পনায় ইহা আনয়ন করা যায় না। এখন নিরীহ প্রজার মনে স্বতই এইরূপ আশঙ্কায় উদয় হয় যে—আমরা ধন, প্রাণ, মান লইয়া আর নিরাপদে কেমন করিয়া কাল কাটাইব। এই ধর্ম্ম-বিপ্লবের মধ্যে কোন প্রকার আইন পাশ করিলে পাছে কোন অঘটন সংঘটন হইতে পারে বলিয়া রাজা প্রথমে কোনরূপ কড়া হুকুম জারী করেন নাই। শেষ সৈন্য সজ্জা ও কড়া প্রহরার দ্বারা দমন করিয়াছিলেন।

প্রতি বৎসর এই বকরীদ উপলক্ষে এক এক স্থানে এইরূপ অশান্তির অনল জ্বলিয়া উঠে। জানি কেন এমন হয়; ধর্ম্মকর্ম্মে এরূপ অধর্ম্মাচরণ হওয়া কখনই উচিত নহে। ধর্ম্ম যাহা, সত্য যাহা, তাহা সকলেরই সমান—ইহাতে হিন্দু-মুসলমান নাই হিন্দু হউন, আর মুসলমানই হউন, যাঁহারা যথার্থ ধার্ম্মিক, তাঁহারা শান্তির পবিত্রতে কখন অশান্তি আনয়ন করিতে চাহেন না। ধর্ম্মসাধনা করিলেই হৃদয়ে প্রকৃত শান্তি পাওয়া যায়—এ বিষয় আর কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে মতভেদ হইতে পারে না। ধর্ম্ম করিতে গিয়া যদি লোকের সর্ব্বনাশ করিব, যদি কেবল মাত্র বাড়াইয়া ভয়ানক পৈশাচিক বৃত্তির প্রশ্রয় দিব—তাহা হইলে তাহা ধর্ম্মসাধনা কেমন করিয়া বলিব। গো-হত্যা লইয়া প্রতি বৎসর হিন্দু-মুসলমানে এইরূপ বিরোধ হইবে—ইহা কিরূপ কথা? হিন্দু ও মুসলমান কোনও বিদেশীয় জাতি নহে। এক মায়ের দুই সন্তান; যখন এত নৈকট্য সম্বন্ধ তখন এরূপ বিরোধ হইবার কারণ কি? গরু সমগ্র পৃথিবীবাসীর পক্ষে মহোপকারী পশু; এরূপ আবশ্যকীয় পশু বোধ হয় জগতের সৃষ্টিতে মানবের আর দ্বিতীয় নাই। গরু দ্বারা উপকৃত নহেন, এমন লোক জগতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এমন গো-বংশ ধ্বংস

করিতে কে ইচ্ছা করে? হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ খৃষ্টান গো-দুগ্ধে কাহার শিশু না বাল্যাবস্থায় জীবনধারণ করে, কাহার শিশু না গো-দুগ্ধে হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া বাল্যকাল হইতে পরিবর্দ্ধিত হয়। তবে এমন একটী উপকারী পশু বিনাশে প্রতি বৎসর এত মারামারি, এত কাটাকাটি কেন? হিন্দু গরুকে কেবল উপকারী পশু বলিয়াই ক্ষান্ত হয় না—তাহারা তাহাকে দেবতা বলিয়া মানে ইহা তাহাদের শাস্ত্রের উপদেশ—শাস্ত্রপাঠী ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু তাই গো-বধকারীকে শত্রু বলিয়া ঘৃণা করে। মুসলমান হয়তঃ উপকারী পশু বলিয়া মানেন কিন্তু দেবতা বলিয়া মানেন না. ধর্ম্মোদ্দেশে তাহাকে দেবতার স্থানে কোরবানী করিতেও কাতর হন না। এইরূপ মতভেদ লইয়াই বিরোধের সৃষ্টি। ধর্ম্মকার্য্যে আমরা এরূপ ব্যবহারের পক্ষপাতী নহি গরু মত উপকারী জন্তু—ইহা যখন সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, তখন আমাদের মতে এরূপ একটী পশু হননে বোধ হয় সমূহ অধর্ম্ম হয়। মুসলমান উচ্চৈঃস্বরে ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিবেন—"আমাদের এই পর্ব্বের নাম বকর ঈদ, ইহাতে বকর অর্থে গরু কোরবানী করিতে হয়। বকর অর্থে তাঁহারা গো-শব্দই ব্যবহার করেন। আমরা "বকরা" শব্দে ছাগ, মেষই বুঝিয়া থাকি। তাহারা আরও বলেন—একটা দুম্বা বলি দিলে—কেবল একজনের পুণ্য হয় এবং একটা দুম্বা গরীব লোকে একাকী খরিদ করিতে পারে না। তাই দরিদ্র সাধারণের জন্য চাঁদা করিয়া গরু কোরবানীর ব্যবস্থা কোরাণে বিহিত আছে। হিন্দু ও মুসলমান প্রতিবেশী দেশে, চিরকাল এ বিবাদ চলিয়া আসে কেন, মুসলমানও ত এক সময় দেশের রাজা ছিলেন. হিন্দুরাও ত তাহাদের প্রজা ছিল। অনেক মহানুভব রাজাও এ রাজত্বে বিরাজ করিয়াছিলেন. বোধ হয় এ পর্য্য সে সময় সমাহিত হইয়া কখন এরূপ বিবাদ উপস্থিত হয় নাই, কারণ আকবর সাহ, বাবর, হুমায়ুন প্রভৃতির সময়ে এরূপ হইতে পারে নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। অনেক বড় বড় মাননীয় মুসলমানের আমরা মত লইয়া দেখিয়াছি, তাহাদের এ বিষয়ে আদৌ মত নাই। সাধক ইব্রাহিম হজরতের দ্বারা ছলিত হইয়া একদিনে পুত্রকে বলি দিতে অগ্রসর হইলে—ভগবান ভক্তের প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়া ছলনা পরিহার পূর্ব্বক একটী দুম্বা আনিয়া সে দিনকার কোরবানী সমাধা করিতে অনুমতি দিলেন। যদি গরুই সে কোরবানীতে প্রশস্ত, তবে দুম্বা আনিলেন কেন? ধর্ম্ম-সাধনে এত হাঙ্গামাই বা কেন? হাঙ্গামা হইলে ধর্ম্ম হইবে কিরূপে। অশান্তি ত ধর্ম্মের বিরোধী। এই জন্য বলি—হে মুসলমান ভ্রাতাগণ। ধর্ম্মসেবা করিতেছ ভাবিয়া অধর্ম্মে বিজড়িত হওয়া কখন উচিত নহে। উপকারী জন্তু বলিয়া, ইহার দ্বারা কত প্রকারে আমরা উপকৃত ভাবিয়া, একবার স্থিরচিত্তে সে বিষয় মনে মনে বিতর্ক করিয়া তাহার বধ-সাধন সম্পূর্ণ সমীচীন হয় না বলিয়াই ইহাকে পরিত্যাগ করা সকল ধর্ম্মসঙ্গত, অধিকন্তু তাহাতে অশান্তির অনল আর প্রবাহিত হইতে পারিবে না। ইহাতে সকল জাতিরই মঙ্গল হইবে। দেশে আর উভয়পক্ষের মনানল প্রজ্বলিত হইয়া এরূপ দিক্‌দাহ করিতে পারিবে না। ধর্ম্মের কুসংস্কারই উভয় পক্ষকেই মোহিত করিবে।

হিন্দু কখনই মুসলমানগণের বিপক্ষ নহে, তাহারাও মুসলমানের দেবতা মানে এবং তাঁহাদের নিকট অবনত মস্তকে প্রণাম করে। তবে মুসলমানগণ কেন যে হিন্দুর প্রতি এরূপ বিরোধ ভাব প্রকাশ করেন তাহা ভগবানই জানেন। অতঃপর আমরা আশা করি—ধর্ম্ম প্রাণ মুসলমানগণ পরস্পরে একটা সামান্য বিষয় লইয়া এরূপ ভীষণ মনোমালিন্যের সূত্রপাত করিবেন না। আঃ সং—

দস্যুদলন বা অদ্ভুত গোয়েন্দা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অজিত কুমার বলিলেন, "যদি আমার কাজ কর সুকুমার, তাহা হইলে অনেক সময় আমার প্রয়োজন কি তাহা না বুঝিয়া কাজ করিতে হইবে। যাই হোক, তুমি কেন যে সরল হইতে পারিতেছ না, তাহা আমি বুঝিতেছি। আমি বুঝিতেছি যে তুমি এখনও আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পার নাই—আমার ভাবগতিক দেখিয়া, আমার পৌরুষ দেখিয়া তুমি বিস্মিত হইয়াছ, সেই বিস্ময়ের ফলেই তুমি স্বীকার করিয়াছ যে আমার কাজ করিবে, কিন্তু আমি যে তোমার প্রকৃত বন্ধু, আমি যে সরল ভাবেই তোমার সহিত কথা কহিতেছি, এটা তুমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না। কেমন পারকি ?"

বাস্তবিকই সুকুমার সম্পূর্ণরূপে অজিত কুমারকে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। অজিতকুমার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা ও প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি, এই কথা ভাবিয়াই সুকুমার মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার কথায় পরিচালিত হইতেছিল। সে যখন বুঝিল যে, অজিতকুমার তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছেন, তখন তাহার বিস্ময়ের উপর বিস্ময় জন্মিল। সে সত্য কথাই বলিল। বলিল যে তাহার মনে বড়ই ধাঁধা লাগিয়াছিল।

অজিতকুমার বলিলেন,—কিসে তোমার সন্দেহ হইতেছে সুকুমার ?

"আমার মনে হয় যে আপনি কণ্টকের সাহায্যে কণ্টক তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কেন করিয়াছেন ?—স্নেহলতার সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য, তাহার সর্ব্বনাশের পথে আমাকে যন্ত্ররূপে পরিচালন করিবার জন্য নহে কি ?"

"সর্ব্বনাশের কথা কি বলিতেছ সুকুমার ? আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে,সে ইচ্ছা থাকিলে আমি বহু পূর্ব্বেই তাহা করিতে পারিতাম। অনেকদিন পূর্ব্বেই আমি তাহাকে বর্দ্ধমানে বল, চুঁচুড়ায় বল, শান্তিপুরে বল, এই ত্রিবেণীতে বল—যেখানে সেখানে গ্রেপ্তার করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা—"

সুকুমার অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া ত্রস্তভাবে বলিল, "তবে কি আপনি গোয়েন্দা ?"

অজিতকুমার ঈষৎ হাসিয়া বলিয়া আমি গোয়েন্দা।"

সুকুমার ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "এখন ব্যা .. অনেকটা বুঝিতেছি।"

"দেখ সুকুমার, আমি যে যে তাহা তোমাকে বলিলাম। এখন তুমি যদি আমার কাজ কর, তোমার দারিদ্র দূর হইবে, পরম সুখে থাকিবে, শত শত স্নেহলতা তোমার দাসী হইয়া থাকিবে! তোমাকে আমার

বলিতেছি শোন। তুমি যদি আমাকে হত্যা করিতে, তাহা হইলে তুমিও নিস্তার পাইতে না। স্নেহলতার অধীন দস্যু বা নরঘাতক এখনও আছে, তাহারাই তোমার প্রাণ সংহার করিত।"

সুকুমার বিস্মিত হইয়া বলিল, "এমন শয়তানীকে আপনি রক্ষা করিতেছেন কেন?"

"ঠিক বলিয়াছ সুকুমার, সে শয়তানী। তোমার মত অনেকে তাহার আশায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে। দুই একজন গোয়েন্দাও নাকাল হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। শেষে আমি সাধ করিয়া এই কার্য্য গ্রহণ করিয়াছি। আমি স্নেহলতাকে বেশ জানি। বাল্যকাল হইতে তাহাকে শয়তানী শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাই সে শয়তানী। তাহার অন্তর মন্দ নহে, তাহাকে সুপথে চালাইতে পারিলে সে আবার অনেকের আদর্শ হইতে পারে। আমি তাহাকে সুপথে চালাইতে চাই, তাহার মতি-ফিরাইতে চাই।"

"আপনার উদ্দেশ্য আমি বুঝিতেছি, কিন্তু আপনি কেন তাহাকে গ্রেপ্তার করেন নাই, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। এরূপভাবে ফাঁকে ফাঁকে ঘুরিলে কি ফল হইবে?"

"শোন সুকুমার, তবে সকল কথাই তোমাকে বলি। কেশবপুরের নাম শুনিয়াছ কি?"

"শুনিয়াছি।"

"কেশবপুরের জমিদারকে বোধ হয় জান না?" সুকুমার ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে সে জমিদারকে অবগত নহে।

"এই জমিদারের বাড়ীতে কালাচাঁদ একবার ডাকাতি করে। জমিদারের চারি বৎসরের কন্যা ললিতাকে সে ধরিয়া আনে এবং স্নেহলতাকে যে ভাবে প্রতিপালন করিয়াছে, তাহাকেও সেই ভাবে প্রতিপালন করিতে থাকে। ললিতা যখন দুই বৎসরের, সেই সময়ে তাহার মাতৃবিয়োগ হয়, ললিতার পিতা তাহার পর আর দারপরিগ্রহ করেন নাই। তিনি কন্যাকে লাভ করিবার জন্য নানাস্থানে কালাচাঁদের স্তুতি গান করিয়া বেড়ান, অভিপ্রায় এই যে কালাচাঁদের কোন লোক যদি সে কথা কালাচাঁদকে জ্ঞাপন করে, তবে কালাচাঁদ দয়া করিয়া তাঁহার কন্যাকে ফিরাইয়া দিতে পারে। কেশবপুরের জমিদারের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই কালাচাঁদ পরোপকারী ও দয়ার্দ্র হৃদয় ছিল, সে জমিদারের মানসিক অবস্থার কথা শুনিয়া, এক বৎসর পরে, ললিতাকে তাহার পিতৃভবনে রাখিয়া আসেন। কেশবপুরের জমিদার ললিতাকে পাইয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়েন এবং সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রার্থনা করেন—'আমার কন্যা নিতান্ত বালিকা, দস্যু কর্তৃক এক বৎসর প্রতিপালিত হইয়াছে, তাহাকে সংসারে গ্রহণ করিলে আমার বংশ-গৌরব ক্ষুণ্ণ হইবে কিনা, তাহা বলুন।' বহু দেশের নানাস্থানের ব্রাহ্মণমণ্ডলী এই নিমন্ত্রণে আসিয়া একবাক্যে বলেন যে কন্যা এখনও পূর্ণ পাঁচ বৎসরের হয় নাই, তাহার এই প্রবাস ধাত্রীগৃহবাস বলিয়া মনে করিতে হইবে। জমিদার মহাশয় ইহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এক চাল চালেন। তিনি ব্রাহ্মণগণের সমক্ষে ঈশ্বর সাক্ষ্য করিয়া তাহার জমিদারির সম্বন্ধে এক লেখাপড়া করেন। লেখাপড়ার মর্ম্ম এই যে, তাঁহার জমিদারীর এক চতুর্থাংশ তাঁহার

পোষ্যপুত্র- অথবা ভবিষ্যতে যদি তিনি বিবাহ করেন, এবং সেই বিবাহের ফলে যদি তাঁহার সন্তান হয়, তবে সে পাইবে; দ্বিতীয়বারের পত্নী উহা হইতে গ্রাসাচ্ছাদন পাইবেন। জমিদারীর বার আনা রকম অংশ ললিতাকে এই দণ্ডেই দেওয়া হইল। তন্মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ জমিদারির ভূমি ললিতার দানরূপে তিনি কয়েকজন ব্রাহ্মণকে দান করেন। সমগ্র জমিদারীর বাকি অর্দ্ধাংশ ললিতার, তিনি যতদিন বাঁচিবেন, ততদিন কন্যার অন্নেই তিনি থাকিবেন এবং কন্যার জমিদারী দেখিবেন। ইহা ছাড়া লেখাপড়ায় আরও অনেক কথা থাকে। সে সকল কথা তোমাকে পরে বলিব।"

সুকুমার একমনে এই কথা শুনিতেছিল। সে বুঝিল যে কথাটী সম্পূর্ণ সে শুনিতে পাইল না; তথাপি বলিল, 'জমিদার এখনও বাঁচিয়া আছেন?"

"না, ইহার দুই বৎসর পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।"

"ললিতার কি হইল?"

"তাহাই তোমাকে বলিব। ললিতাকে প্রতিপালন করিবার জন্য এক ধাত্রীকে তিনি বাড়ীতে রাখেন। এই ধাত্রীই জমিদারকে মানুষ করিয়াছিল, সুতরাং ধাত্রীর আদরে ললিতা মাতৃবিয়োগ বুঝিতে পারে নাই।"

'জমিদারের মৃত্যুর পর ধাত্রীই বুঝি ললিতাকে প্রতিপালন করিতেছে?"

'হাঁ, ব্যস্ত হও কেন? আমিই তোমাকে সকল কথা বলিতেছি। জমিদারের মৃত্যুর পর ধাত্রী ললিতাকে প্রতিপালন করিতেছিল। এইভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হয়। ইতিমধ্যে কালাচাঁদ সর্দ্দার খুন হয়।"

'খুন? আমি শুনিয়াছি যে রোগে সর্দ্দারের প্রাণ-বিয়োগ ঘটিয়াছিল।"

"সেটী ভুল, খুন অথবা আত্মহত্যা এই দুইয়ের একটী ঘটিয়াছিল। তাহার দলের লোকের অত্যাচারে কর্ণেল বেন্‌সন্ যখন তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিলেন, সেই সময়ে সে আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিল, এইরূপই শুনা যায়। কিন্তু স্নেহলতা সকল দোষ আমার ঘাড়ে চাপাইয়া প্রচার করে যে আমিই তাহাকে খুন করিয়াছি।

"আপনার উপর স্নেহলতার যে ক্রোধ, ইহাও তাহার একটা কারণ বোধ হয়।"

"হইতে পারে। যাক্ কালাচাঁদের মৃত্যুর পর স্নেহলতা এই ললিতাকে আবার ধরিয়া আনে। ধাত্রী তখন কেশবপুরে ছিল না; অন্যত্র নায়েব তাহাকে আহ্বান করায় তাহাকে যাইতে হইয়াছিল। তাহার প্রত্যাবর্ত্তন করিতে তিন দিন লাগে। এই তিন দিনের মধ্যে স্নেহলতা কেশবপুরে গমন করিয়া বাড়ীর ঝি-চাকরদিগকে প্রভূত অর্থ উৎকোচ স্বরূপ প্রদান করে এবং তাহার এই কার্য্য প্রকাশ হইলে সকলকেই খুন করিবে বলিয়া ভয় দেখায়। তিনজন পরিচারিকা এবং দুইজন চাকরকে অর্থবলে হস্তগত করিয়া স্নেহলতা প্রচার করায় যে ললিতা খুন হইয়াছে, দস্যুগণ তাহাকে খুন করিয়াছে। গ্রামে অনেকে বলে যে তাহারা ললিতার দেহ খণ্ড খণ্ড অবস্থায় গ্রামের প্রান্তরে দেখিয়াছে। ধাত্রী একথায় বিশ্বাস করে নাই, সে হুগলিতে কর্ণেল বেন্সনের নিকটে এক খানি পত্র ও ললিতার ফটো প্রেরণ করে। আমি সেই অবধি ললিতার সন্ধানে ফিরিতেছি।

"ললিতা কি সত্যই বাঁচিয়া আছে ?

"স্নেহলতা কেন ললিতাকে ধরিয়া আনিল ?"

"আমার মনে হয় যে এক বৎসর তাহার সহিত বাস করায় স্নেহলতা ললিতাকে ভুলিতে পারে নাই। তাহার পর ললিতার পিতা যে লেখাপড়া করিয়া যান, তাহাতে এইরূপ সর্ত্ত আছে যে, ললিতাকে যে প্রতিপালন করিবে সে বিশ সহস্র টাকার অধিকারী হইবে; ললিতার যদি স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে, তবে তাহার সমস্ত বিষয় প্রতিপালকের হইবে। সুতরাং স্নেহলতার লোভও জন্মিয়া থাকিতে পারে। আমি এই সকল কথা জানি, অধিকন্তু ধাত্রীর পত্রে আমি ললিতার সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারিয়াছি, এই কারণেই স্নেহলতা আপনাকে ইহজগত হইতে বিদায় করিতে চাহে।"

সুকুমার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এখন সব বুঝিলাম। এখন আমি স্বীকার করিতেছি যে আপনি যে কার্য্য বলিবেন, আমি সেই কার্য্যই করিব।"

"স্নেহলতার চাঁদপানা মুখখানি দেখিয়া গলিয়া যাইবে না ?"

"না।"

"তাহার চতুরতায় ও কথার ছলনায় তোমার মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইবে না ?"

"না।"

"স্নেহলতার নিকটে যে কাহিনী শুনিয়াছ এবং আমার নিকটে যে কাহিনী শুনিলে, এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টায় তোমার বিশ্বাস হয় ?"

"আপনার কথাতেই আমার বিশ্বাস হইতেছে। ললিতার সন্ধান করাই আপনার উদ্দেশ্য সে উদ্দেশ্য সাধনে আমি যথাশক্তি চেষ্টা করিব।"

"পুনরায় বলি, স্নেহলতা আবার যদি তোমাকে কিছু বলে, তাহা হইলে তাহার কথায় ভুলিবে না ?"

"না।"

"শোন যদি তাহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হও, আমার কথা ভুলিয়া যাও, আমার মতের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য কর, তাহা হইলে আমি বাধ্য হইয়া তোমাকে খুন করিব।"

"বেশ, তাহার কাজ করিলে মৃত্যু, আপনার কাজ না করিলে মৃত্যু। ইহা আমি বুঝিলাম।"

"দেখ স্নেহলতা যে সে স্ত্রীলোক নয়, খুব সাবধান।"

"তাহাই থাকিব।"

"এইবার একটা কথা। সত্য বল, স্নেহলতাকে ভালবাস ?"

"তাহার রূপে ও ঐশ্বর্য্যে আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম, এখন আর তাহাকে ভাল বাসিতে ইচ্ছা করে না। এখন কি করিতে হইবে বলুন।"

"শোন" বলিয়া অজিতকুমার অতি মৃদুস্বরে সুকুমারকে কয়েকটি কথা বলিয়া দিলেন। সুকুমার হাসিতে হাসিতে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল। পরে দুইজনে অভিবাদন করিলেন। সুকুমার ত্রিবেণীর প্রান্তভাগের সেই হর্ম্ম্য হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

শ্রীপাঁচুগোপাল মল্লিক।

প্রাপ্ত দ্রব্যাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

চন্দ্রকান্তি।—শ্রীযুক্ত কবিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র বিশারদ কৃত অঙ্গলেপন—ইহা সাবানের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইলে ভাল হয়, ইহা সম্পূর্ণ স্বদেশী উপাদানে প্রস্তুত। ৬৭ নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতায় উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের নিকট উহা পাওয়া যায়। মূল্য ৷৵০ আনা।

ত্রুটি স্বীকার।—বিগতবার আমরা "কেশ কুসুমাকর" তৈলের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছি তাহা ভুলক্রমে নামান্তর হইয়া গিয়াছে। উক্ত তৈলের প্রস্তুতকার রাজ বৈদ্য শ্রীযুক্ত নরায়ণজী কেশবজী। ১৭৭ নং হ্যারিসন রোড কলিকাতা। ইহাদের তৈল কেশ "কুসুমাকর" শিররোগের উপযোগী। ইহাদের মদনমঞ্জুরীও শুক্রসম্বন্ধীয় রোগের জগদ্বিখ্যাত মহৌষধ।

সমালোচনা।

অশ্রুকণা।—শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত দাস প্রণীত একখানি কবিতা পুস্তক। পুস্তক খানির অনেকগুলি কবিতায় বেশ মধুরত্ব আছে। মূল্য ।০ আনা।

—:০:০—

ধর্ম্ম-প্রবন্ধ।

৺প্রিয় নাথ মুখোপাধ্যায় এম. এ, প্রণীত। মূল্য ৷৹ আনা। ৪নং তেলকল ঘাট রোড হাওড়া, কর্ম্মযোগ প্রেসে হওয়া যায়। পুস্তক খানি পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম। প্রিয়বাবু যে একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন পুস্তক পাঠে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এ পুস্তক খানি, সকল ধর্ম্মাবলম্বীর পাঠের উপযোগী বলিয়া মনে হয়। কারণ "ধর্ম্ম-প্রবন্ধে' নিবদ্ধ ধর্ম্মমত সম্প্রদায়িক দোষ দুষ্ট নহে। সোজা কথায় বলিতে গেলে ইহাতে "গোঁড়ামির লেশ মাত্র নাই। ইহার ভাব খুব উদার ও মর্ম্মস্পর্শী। আমাদের মতে এরূপ পুস্তক স্কুল কলেজের ছাত্রদিগের পাঠ্য পুস্তক রূপে নির্ব্বাচিত হইলে ভাল হয়।

পুস্তক খানি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিলাম।

"গভীর রজনী ভাবুক ভাবনায় মগ্ন, প্রলয় শঙ্খ নিনাদিত হইল বজ্র কণ্ঠে উচ্চারিত হইল 'আমি আছি"। শব্দ শুনিয়া ভাবুক স্তম্ভিত হইলেন। পুনঃ পুনঃ বজ্র নির্ঘোষ বৎ শব্দ উত্থিত হইল "আমি আছি"।

* * * * * *

ব্যতিব্যস্ত হইয়া ভাবুক বলিলেন, "ভাল ভাল তুমি আছ তাহার জন্য এত শঙ্খধ্বনি কেন! আমার রবিশশী রহিয়াছে, দেশ কাল ক্রীড়া করিতেছে, সমীরণ বিচরণ করিতেছে, নক্ষত্র ফুটিতেছে, সুখ দুঃখের তরঙ্গ উঠিতেছে, চিন্তা হিল্লোল প্রবাহিত হইতেছে, বুদ্ধিবৃত্তি ধাবিত হইতেছে, বন্ধুবান্ধব আত্মীয় পরিজন বেষ্টন করিয়া মধুময় সংসার গীত গাহিতেছে—ইহারা কতবার তোমার ন্যায় "আমি আছি' "আমি আছি" বলিয়া চীৎকার করিতেছে—কেহে তুমি অহঙ্কারী অহঙ্কার ধ্বনী করিতেছ?"

কুষ্ঠাশ্রম।

হাওড়ার সুপ্রসিদ্ধ কুষ্ঠ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ শর্ম্মা কবিরঞ্জন—কুষ্ঠ চিকিৎসায় সুনিপুণ, সম্প্রতি তিনি নিজের তত্বাবধানে একটী কুষ্ঠাশ্রম খুলিয়াছেন। ইহাতে কুষ্ঠরোগী অনায়াসে বাসস্থান লইয়া উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের দ্বারা চিকিৎসীত হইতে পারেন। কুষ্ঠরোগ অতি ভয়ানক এবং সংক্রামক, কবিরাজ মহাশয় এই আশ্রমের এমন সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন যে, রোগীগণের কোন প্রকার কষ্ট হইবার কারণ নাই। বিশেষ বিবরণ—১০২ খুরুট রোড হাওড়া, উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের নিকট জ্ঞাতব্য।

বাঙ্গালীর শারীরিক অবনতি।

Dying race প্রণেতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহোদয় উক্ত পুস্তিকা প্রকাশ ও তাহার বঙ্গানুবাদ সাধারণের নিকট বিনামূল্যে বিতরণ দ্বারা, সংখ্যার ক্রমিক হ্রাসে বাংলার হিন্দুজাতি যে ক্রমে লোপ পাইতে বসিয়াছে, তাহা সাধারণের নিকট স্পষ্ট সপ্রমাণ করিয়া অনেকের নিকট ধন্যবাদ এবং অনেকের নিকট গালাগালি অর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি উক্ত সংখ্যা হ্রাসের যে সমস্ত কারণ দেখাইয়াছেন, তাহা আংশিক সত্য হইলেও বঙ্গীয় হিন্দুদিগের এই ভয়াবহ ক্রমাবনতি যে সাধারণ বাঙ্গালীর অবনতির একটী অংশ এবং মুসলমান সম্প্রদায় কতকগুলি বিশেষ কারণে এই নিদারুণ ক্রমাবনতির হস্ত হইতেও আংশিক অব্যাহতি পাওয়ায় যে হিন্দুদিগের তুলনায় কথঞ্চিৎ উন্নতি দেখাইতেছে; এবং প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দু, মুসলমান, বাঙ্গালী জাতির উভয় শাখাই যে ক্রমে ক্রমে অবনতির নিম্নতম স্তরে নামিয়া যাইতেছে, এই ভীষণ সত্য বোধ হয় আমরা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। সেন্সাস্ রিপোর্ট, স্যানিটারি কমিশনারের রিপোর্ট জন্মমৃত্যু সংখ্যা বিবরণী প্রভৃতি সহস্র প্রমাণ সত্ত্বেও একটী সামান্য ঘটনার কথা পাঠকগণের নিকট নিবেদন করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে Medical Collegeএর বাঙ্গালী ছাত্রদিগের মধ্যে একজন খুব সবল ও সুস্থ যুবকের রক্তের সহিত উক্ত কলেজের একজন ইউরোপীয় অধ্যাপকের রক্ত তুলনা করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে যুবকের রক্তের হিমোগ্লোবিনের ৮১/৬০ ভাগ মাত্র। বয়সের তুলনায় যুবকটীর রক্তে হিমোগ্লোবিন অধিক হওয়া উচিত ছিল। অতএব সমবয়স্ক সুস্থ ইংরাজ যুবক অপেক্ষা বাঙ্গালী যুবকদিগের রক্তে হিমোগ্লোবিনের অংশ যে আরও অল্প তাহার আর সন্দেহই নাই। আরও, পূর্ব্বোক্ত যুবকটীর শরীর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যার্থী সাধারণ বঙ্গযুবক অপেক্ষা অনেক ভাল। পরন্তু অধ্যাপকটী যে সাধারণ ইংরাজ অপেক্ষা অনেক অধিক বলিষ্ঠ বা সুস্থ তাহা বিবেচনা করিবার কোনও কারণ ছিল না। বস্তুতঃ বহু পরীক্ষায় ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে যে বর্ত্তমান-কালে সাধারণ ইংরাজের রক্তের হিমোগ্লোবিনের পরিমাণে ৭/৮ অংশ মাত্র। বর্ত্তমান ইউরোপীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান বলেন—আমরা নিশ্বাসের সহিত যে বায়ু টানিয়া লই, তাহার মধ্য হইতে Oxygen গ্রহণ করিয়া রক্তের সহিত মিশানই ওই হিমোগ্লোবিনের কার্য্য। এবং রক্তের উপর oxygenএর কার্য্য হইতেই শরীর পোষণ, রক্ষা ও গঠন হইয়া থাকে। এই কার্য্য এত আবশ্যক যে Oxygenএর সম্পূর্ণ অভাব অল্প সময়ের মধ্যেই মৃত্যু আনয়ন করে। অতএব রক্তের Oxygen গ্রহণ-শক্তির অল্পতা যে

দৌর্ব্বল্যের একটি প্রধান কারণ, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

এই হিমোগ্লোবিনের অভাব ও তজ্জনিত দৌর্ব্বল্যের কারণ কি অনুসন্ধান করিতে গেলেই দুইটী বিভিন্ন দলে দুই প্রকার কথা বলিতেছেন—দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপীয় বলিতেছেন—তোমাদের আহারই এই দৌর্ব্বল্যের জন্ম প্রধানতঃ দায়ী। তোমরা নিরামিষ ভোজী;—অতএব তোমরা দুর্ব্বল। তোমরা অধিক পরিমাণে মাংস আহার করিতে আরম্ভ কর, তাহা হইলেই তোমরা সারিয়া উঠিবে। মাংসাহার ভিন্ন তোমাদের আর গতি নাই। আর খাঁটী হিন্দু বলিতেছেন—রাম। ওদিক দিয়া যাইও না; আচার পরায়ণ হও; ঘৃত, সৈন্ধব ও আতপ তণ্ডুল আরম্ভ কর, আর বীর্য্য ধারণ ও ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস কর। দেখিবে তোমাদের কত শীঘ্র কিরূপ উন্নতি হয়। আজকাল আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকে এই দুই দলের এক দল ভুক্ত। কিন্তু কোন দলকেই ত এ পর্য্যন্ত সুফল ফলাইতে দেখিতে পাইতেছি না। দল দুইটী যদি ভাগ করিতে হয়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায়—মোটামুটী দেশের বড় লোকেরা এবং যুবকদল অর্থাৎ যাহাদের দুপয়সা ব্যয় করিবার সামর্থ্য আছে এবং অগ্নির জোর আছে, তাহারা মাংসাহারের পক্ষপাতী। এবং বৃদ্ধেরা ও মধ্যবিত্ত লোকের নিম্নস্তর কার্য্যতঃ না হইলেও, খাঁটী হিন্দুমতাবলম্বী। এই ভাগের মধ্যে বাদসাদ অবশ্যই আছে।

দুই একটী ব্রহ্মচর্য্য-শিক্ষাশ্রমের কথা আমি অবগত আছি। নিতান্ত দুঃখের সহিত এই কথা স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছি। যে কার্য্যক্ষম, দেবচরিত্র পরিচালকগণের বিশেষ চেষ্টা ও কঠোর নিয়মাবলী সত্ত্বেও সাধারণ ছাত্র মণ্ডলীকে বীর্য্যধারী ব্রহ্মচারী করিবার চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে। এরূপ শিক্ষক ও নিয়ম সত্ত্বেও যখন অল্প সংখ্যক ছাত্রের উপর এইরূপ অবিরত চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে, তখন কেবল মাত্র মত প্রচারে কি ফল ফলিবে, তাহা পাঠক সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন।

আবার যাহারা পান ভোজনে ইউরোপীয় প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাদেরও যে কোন বিশেষরূপ শারীরিক উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায় নাই, একথা সকলেই স্বীকার করিয়া লইবেন। ইউরোপীয়দিগের সহিত সমান হওয়া দূরে থাকুক, তাহারা যে তাহাদের খাঁটী হিন্দু ভ্রাতাদিগের অপেক্ষা কোন অংশে উন্নত হইয়াছেন, তাহারও কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। লাভের মধ্যে তাহারা নিজের ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া ভাবী বংশধরগণের দারিদ্র্য বর্দ্ধনের উপায় করিতেছেন মাত্র। স্থান,—কাল ও অবস্থার উপযোগিতা, অনুপযোগিতা বিবেচনা না করিয়া কোন একটী রীতি প্রবর্ত্তন করিতে গেলে, এইরূপ নিষ্ফলতা অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার উপায়েই স্থান কাল অনুকূল হইলেই সুফল ফলে এরূপ দেখা গিয়াছে। প্রাচীন হিন্দুগণ মাংসাহার ও নিরামিষ ভোজনে বীর্য্যধারণ, ব্রহ্মচর্য্য উভয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া রজঃপ্রধান, যুদ্ধ কুশল ক্ষত্রিয়দিগের মাংসাহার ও সমগুণাবলম্বী, সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণদিগের সাত্ত্বিক আহার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদের সুবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে উভয় দলই তাঁহাদের একাংশ দেখিয়া কামড়াকামড়ি করিতেছেন।

কিন্তু পান ভোজনে ইউরোপীয় আচারের পক্ষপাতিগণ মনে রাখিবেন—অহিংসা পরায়ণ নিরামিষ ভোজী বৌদ্ধগণ অর্দ্ধ পৃথিবী জেতা রণদুর্ম্মদ গ্রীকজাতির প্রবল আক্রমণ হইতে আত্ম রক্ষায় সম্পূর্ণ সক্ষম ছিলেন। মহারাজ ধর্ম্মাশোক স্বীয় রাজ্য মধ্যে পশুবধ বন্ধ করিলেও তাঁহার প্রজাকুল দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ করিত না। আবার নিরামিষ ভোজীগণ একবার বর্ত্তমান ইউরোপের দিকে চাহিয়া দেখিলেই আমিষ ভোজীদিগের প্রতাপ অনুভব করিতে পারিবেন। বস্তুতঃ আমিষ ভোজন ভাল কি নিরামিষ ভোজন ভাল, তাহা লইয়া যুগ যুগান্ত ধরিয়া তর্ক বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। কবে যে মীমাংসা হইবে, তাহারও কোন স্থির নাই। আহারাদি সম্বন্ধে যে সমস্ত মূলতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই গুলি পালন করিয়া চলিতে পারিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে। শরীরের পুষ্টির জন্য যাহা আবশ্যক সেই সমস্ত পদার্থ যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে আছে, তাহা আমিষই হউক বা নিরামিষই হউক, সেই খাদ্য পরিপাক করিয়া এই সমস্ত পদার্থ শরীরের মধ্যে লইতে পারিলেই আহারের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতে পারিবে।

এই শোচনীয় অভাবের আর একটি কারণ শুনিতে পাওয়া যায় সেটী আমাদের দারিদ্র্য। আমরা উদর পুরিয়া খাইতেই পাই না, পুষ্টিকর খাদ্য পাইব কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। কারণ এ কথাটির মধ্যে যথেষ্ট সত্য আছে। কিন্তু এ কথা আমাদের দেশের দরিদ্র নিরীহ প্রজাকুল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য হইলেও বড়লোক ও মধ্যবিত্ত দিগের উদরম্ভরির পক্ষে যে একেবারেই খাটে না, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেণ। তবে তাহাদিগকেও তাহাদের নিরন্ন দরিদ্র ভ্রাতৃগণ হইতে সুস্থ ও সবল দেখিতে পাওয়া যায় না কেন? ইহার উত্তর দিতে হইলে পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়—আমাদের দেশে দরিদ্রগণ না খাইয়া দুর্ব্বল আর ধনীগণ লোভে পড়িয়া পরিপাক শক্তির অধিক খাইয়া বদহজমে দুর্ব্বল। এক্ষণে আমাদের দেশে ধনী ও মধ্যবিত্ত দিগের মধ্যে (Dyspepsia) এত প্রবল যে সে কথা স্মরণ করিতে মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। আমরা দরিদ্র এবং দারিদ্র্য বশতঃ পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহে অসমর্থ,—এ কথা স্বীকার করিয়া লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেই কি আমাদের দায়িত্ব শেষ হইল? আমরা কি এই দারিদ্র্যের মধ্যেও অবস্থার উপযুক্ত অবস্থা করিয়া চলিয়া এই ভয়াবহ অবনতির স্রোত একটুও রোধ করিতে পারি না? অন্ততঃ চেষ্টা করিয়া দেখিলেও কি ক্ষতি আছে? দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ভিন্ন অন্য চেষ্টায় এ মরণের কবল হইতে অব্যাহতি লাভ করা অসম্ভব। যাহাতে আমরা এই সকল কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারি, তাহার চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। দেশের ধনীগণ নিজের আত্মীয়-স্বজনের এবং জমীদারির উন্নতির প্রতি কেবল মাত্র দৃষ্টি না রাখিয়া একবার দেশের প্রতি এবং দেশীয় নিরন্ন ভ্রাতাবর্গের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন। তাহা হইলে অনেকাংশে আমাদের দেশে মৃত্যু সংখ্যার হ্রাস হইবে—নতুবা আর উপায় নাই।

হিন্দুর গৃহস্থালী ও হিন্দুত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

হিন্দুর গৃহস্থালী অতি পবিত্র, ভাল করিয়া এই থালী সাজাইতে পারিলে ইহা স্বর্গের সুষমায় সুশোভিত হইতে পারে। কিন্তু আজ কাল সে ইচ্ছা কাহার আছে, কেই বা আর এই হিন্দুর পরম পবিত্র প্রথা সকল প্রতিপালন করিয়া এই থালীর সাজ-সজ্জার অঙ্গ পরিপূর্ণ করিতে ইচ্ছা করেন। হিন্দু আজ অহিন্দু হইতে বসিয়াছে বলিয়াই ক্রমশঃ তাহাদের দুর্গতি বাড়িতেছে, তাই তাহাদের হাহাকারে চারিদিক মুখরিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

দেবসেবা, অতিথি-সেবা, বিপন্নের সহায়তা করা হিন্দুত্বের প্রধান লক্ষণ। এই সকল ধর্ম্মকর্ম্ম আজ হিন্দু সংসার হইতে একেবারে লোপ পাইয়াছে বলিয়া হিন্দুর গৃহস্থালীর আর সে পরম মনোহর শোভা নাই। ভাবী বংশধরগণও পিতা মাতার অনুকরণ করিয়া বিপথে যাইতে বসিয়াছে। ইহাকে আবার পূর্ব্বভাবে অবস্থিত করিতে হইলে, ভাবী বংশধর পুত্রকন্যাগণকে সৎ শিক্ষা দান ও চরিত্রবান করিতে হইবে। বংশের পুত্রকন্যা উচ্ছৃঙ্খল ও বিপথগামী হইতে আরম্ভ করিলেই বুঝিতে হইবে যে বংশের অবনতির সূত্রপাত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যদি এই পবিত্র সংসারে সুখে বাস করিতে চাও, যদি পুনরায় আর্য্যের সেই রমণীয় ভাবে গৃহস্থালী সাজাইতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক মাতাপিতা এবং অভিভাবককে তাহাদের পুত্র-কন্যাগণের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। হিন্দুর--সংসারের প্রত্যেক লোক ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত না হইলে ইহার প্রকৃত শোভা হইতে পারে না।

হিন্দুর সকল কার্য্যই ধর্ম্মের সহিত ওত-প্রোত ভাবে আবদ্ধ। ধর্ম্ম ছাড়া তাহাদের কোন কার্য্যই নাই। হিন্দুর ভোজন ব্যাপার বড়ই গোপনীয়। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের ভোজন কাহার সাক্ষাতে সমাহীত হইতে পারে না। গৃহী ব্যক্তি স্বপাকে অথবা স্ত্রীর হস্তে, অভাবে পুত্র বা পুত্র বধূর হস্তে রন্ধন করাইয়া ভোজন করাই বিধি। স্বগোত্র ব্যতীত ভিন্ন গোত্রে ভোজন করিতে নাই—তাহাতে তপস্যার বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। রন্ধন কার্য্যে রন্ধন কর্ত্রীর তাড়িৎশক্তি ঐ দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া শারীরিক অনিষ্ট সাধন করিতে পারে—এইজন্য গোত্রান্তরে ভোজন হিন্দু ব্রাহ্মণের পক্ষে একান্ত বর্জ্জনীয়। আহারীয় দ্রব্য সকলই ভগবানে সমর্পণ করিয়া হিন্দু আহার করে—ইহা একটী যোগ সাধনা, এইজন্য সংযত-বাক্ হইয়া ইষ্ট-দেবতাকে নিবেদন করতঃ হিন্দু আহার ক্রিয়া সমাধা করে। এইজন্য ইহা সকলের সম্মুখে সমাহিত হওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু আজ কাল কয়জন হিন্দু আহারের এইরূপ নিয়ম প্রতিপালন করেন? প্রতিপালন করেন না বলিয়াই আজ কাল আহারে এত বিপত্তি। ঈশ্বরে আহারীয় দ্রব্য সর্ব্বাগ্রে নিবেদন করিয়া বিনাবাক্য ব্যয়ে আহার করিলে আহারীয় দ্রব্য দন্তের দ্বারা ভাল রূপ চর্ব্বিত হইয়া সহজে পরিপাক হইয়া যায়—তাহাতে কোন রূপ শরীরের অনিষ্ট বা রোগোৎপত্তি হইতে পারে না—শাস্ত্রকারগণ এইজন্যই আহারের এত বাঁধাবাধি নিয়ম করিয়াছেন। কিন্তু আজকাল গোত্র বিচার ত পরের কথা, কত অখাদ্য

কুখাদ্য আজ কাল হিন্দুর উদর পূর্ত্তি করিতেছে তাহার ইয়ত্তা কে করে। প্রথমাবস্থায় এরূপ আচার বিচার বিহীন আহারেও হিন্দুর হিন্দুত্ব নাশ হইয়া থাকে। কারণ ইহার সহিত মনের নৈকট্য সম্বন্ধ। যে যেরূপ আহার করে, তাহার মন তদ্ভাবাপন্ন হইয়া থাকে—ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। তুমি সাত্ত্বিক ভাবে হবিষ্যান্ন ভোজন কর, তোমার মনের ভাব এক প্রকার হইবে; আবার তুমি মদ্যমাংস দ্বারা উদর পূর্ণ কর—তাহাতে তোমার মনের গতি অন্যরূপ হইবে—ইহা স্থির সিদ্ধান্ত, এবং বৈজ্ঞানিক সত্য। পোষাকেও মনের গতি ঐরূপ হইয়া থাকে—হিন্দুর পোষাক পরিলে মনের গতি যেরূপ থাকে, সাহেবী পোষাক পরিলে মন ভিন্ন ভাবে পরিণত হয়, মেজাজ সাহেবী ধরণের হইয়া যায়। আপন ছাড়িয়া যেন নিজেকে পরের করিয়া ফেলিতে হয়। অন্য কোন গুণে আমি ইংরাজের সমকক্ষ নহি—কিন্তু পোষাকের জন্য যেন আমি আর সে আমি নহি, আমার হিন্দুত্ব যেন তিরোহিত হইয়াছে—আমি যেন কিম্ভূতকিমাকার হইয়া গিয়াছি, দাঁড়কাক হইয়া ময়ূরের দলে মিশিতে যাইতেছি। শেষে ময়ূর হইতে পারিব না—দাঁড়কাকও আমাকে দলে লইবে না—আমি দুকূল হারাইয়া এখন অকূলে ভাসিতে আরম্ভ করিলাম—তা কি? তাই বলি, ভাই হিন্দু! আর কেন, আর কেন আত্মনাশ করিয়া পরকাল নষ্ট করিতেছ। যে আপনার ছাড়িয়া পর ভজিতে যায়, তাহার মনুষ্যত্ব কোথায়?—যাহারা যথার্থ মনুষ্য তাহারা এরূপ মানুষকে কাছে যাইতে দেয় না—অন্তরের সহিত তাহাকে ঘৃণা করে। আমি একবার একটী খাস বিলাতী সাহেবকে এরূপ করিতে দেখিয়াছি। একবার কোন মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান পরিবর্ত্তন হইবার আবশ্যক হওয়ায়, একজন খৃষ্টানকে সেই পদে অধিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করা হয়। কিন্তু যিনি সেক্রেটারী ছিলেন তিনি প্রকৃত বিলাতী সাহেব। তিনি আপত্তি করিয়া বলিলেন একজন Half casteকে এ পদ দেওয়া যাইতে পারে না, তাহা হইলে তাহাকে আমরা হাত তুলিয়া সেলাম করিতে পারিব না। যে স্বার্থের জন্য আপনার যাবতীয় ধর্ম্মকর্ম্মে জলাঞ্জলী দিয়া পরের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে তাহার আবার মনুষ্যত্ব কি? বলা বাহুল্য, এই প্রতিবাদে সেই স্বদেশী খ্রীষ্টান সাহেবের সে পদ পাওয়া হইল না। ভাই। হিন্দু। আপন ছাড়িয়া পরের হইতে গেলে তাহাকে এইরূপ ভাবেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হয়। তাই বলি ভাই। আর কেন, এই দেববাঞ্ছিত দেশে হিন্দুর পবিত্র কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আর কেন মোহে পড়িয়া পরকাল নষ্ট কর, ঘরে ফেরো ভাই, তোমার সোনার গৃহস্থালী আজ তোমার কার্য্যদোষে মলিনতা প্রাপ্ত হইতেছে, তোমার প্রাণাপেক্ষা গরীয়সী ধর্ম্ম, তোমার হিন্দুত্ব আজ তোমার কর্ম্মদোষে লোপ পাইতে বসিয়াছে। তুমি আর্য্যবংশের ধূরন্ধর হইয়া, আর্য্যের পবিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, সনাতন আর্য্যধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আজ একি করিতেছ? কাঞ্চন-ভ্রমে কাচের আদর করিতেছ! যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ তোমার পক্ষে সহজ সাধ্য, তাহা ছাড়িয়া কেন বিপথে যাইয়া পরকাল নষ্ট করিতেছ? তোমার পবিত্র গৃহস্থালী, যাহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে ত্রিদিবের

শোভাও তুচ্ছজ্ঞান হইত; যে আশ্রমের পবিত্র আশ্রয়ে শিবজীব অমরত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইত। জানি না, আজ কোন পাপে কাহার অভিশাপে তোমরা সে স্বর্গীয় বিভব, সে প্রাণা-রাম পবিত্রতা, সে সদানন্দময় হিন্দুর গৃহস্থালী এবং তোমার নিজের সম্পত্তি "হিন্দুত্ব" হারাইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেছ না। এখন না বুঝিতে পার, পরিণামে যে ইহাতে বিষময় ফল ফলিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আং সং

ধ্যান ফল।

বকফুল-বৃক্ষোপরে দেখবে কেমন
নিরাপদে আছে কীট, করিয়া ভক্ষণ
কচি কচি পাতা তার পরম হরষে!
শালিকাদি পাখী তার ঘুরে আশে পাশে
কীট অন্বেষণে, কভু দেখেনা তাহারে,
পত্রবর্ণ কীটে তারা পত্র মনে করে।
—চোখ মে'লে খায় পাতা, করিয়া চিন্তন
অহরহ তরু রূপে হয়ে নিমগন,
কীট যেন দাতারূপ ভুলিতে না পারে,
ধ্যানগুণে পত্র রঙ হয় কলেবরে।
পত্রভ্রমে শালিকাদি কীট নাহি খায়।
ধ্যানের এমনি ফল বিদিত ধরায়॥
হায়রে! মূরখ মন! দেখিলি না চেয়ে
তাঁহারে যাঁহার কোলে আছিস্ তুই শুয়ে।
খে'য়ে দে'য়ে নে'চে কুন্দে যাঁহার কৃপায়;
স্নেহ ক'রে সদা যিনি আহার যোগায়,
চোখ মে'লে ওরে মন! দেখ তাঁরে চেয়ে,
সদা তাঁর চিন্ত রূপ, যাক গুণ গেয়ে;
যখন যেখানে থাক যেই কাজ কর,
তাঁরি রূপ কর ধ্যান তাঁরি গুণ স্মর।
কালে তাঁর পাবে রূপ ভুবন মোহন;
কাম আদি অরি তোর সখ্যতা গ্রহণ-
করিবে, যমের ভয় সব হবে গত;
ধ্যান বলে সুখে রবে ওই কীট মত।
এথা হেথা হ'তে কীট আনিয়া ভ্রমর,
বেঁধে রাখে মৃন্ময় বাসার ভিতর,
ভয়ে জড় সড় কীট চিন্তিয়া ভ্রমরে,
কিছুকাল পরে সেও ভৃঙ্গরূপ ধরে',
বন্ধন কাটিয়া যে'তে সমর্থ সে হয়।
বিভু ধ্যানে সেই রূপ মনরে। নিশ্চয়,
বিভুরূপ লভি এই সংসার বন্ধন
কাটিয়া সমর্থ হবে করিতে গমন॥

শ্রীজগদ্বন্ধু চৌধুরী।

ধর্ম্মের ভাণ

বা

অদ্ভুত সতীত্ব কাহিনী।

(গল্প).

(১)

কোজাগরী নিশি। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর রজত-আভা জগতের কোলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যার আগমনে পৃথিবী আনন্দময়ী। চারিদিকে আনন্দ কোলাহল, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাংশবাদ্যর গভীর নিনাদে নিশার তন্দ্রা ভাঙ্গিতেছে, মাঝে মাঝে হুলুধ্বনি মানবের মনে, গভীর ভাব অঙ্কিত করিয়া দিতেছে। কোথাও পূজারি ব্রাহ্মণের মন্ত্রের ডাক, কোথাও সঙ্কীর্ত্তনের মধুর সুর, কোথাও মাতোয়ারা যুবকদলের উচ্চখল পঞ্চমে তান, কোথাও বা তাস, পাশার গণ্ডগোল;—এইরূপে চারিদিকেই কেবল আনন্দচ্ছাস, এমন সময়ে নির্জ্জন মধুর-

পুকুর পাড়ে বকুল তলায় একাকিনী ওকে। মধুর-পুকুরের চারিপাড় ফুল বাগানে পূর্ণ। কেবল পূর্ব্বপাড়ে কিয়দ্দূর স্থান পরিষ্কার,—বৃক্ষলতাদি শূন্য;—পাকা ঘাটই উহা জুড়িয়া রহিয়াছে। পুকুরের পূর্ব্বপার্শ্বে কিয়দ্দূরে একখানা বাড়ী। ঐ পুকুরের নৈঋত কোণেই বকুলগাছ। সেই বকুল তলায় একাকিনী বসিয়া এক সধবা রমণী। বয়স পঞ্চদশ বৎসর মাত্র। পরিধানে একখানা গৈরিক বসন, হাতে এক নামাবলী। সম্মুখে পিতলের এক কৃষ্ণমূর্ত্তি। পার্শ্বে একগাছী রজ্জু আর একটী পিতলের কলস।

অহো! কি সুন্দর যুবতিখানি। নবীন বয়সে নবীন যোগিনী। যেন মূর্ত্তিমতী ভৈরবী। গৈরিক বসন খানি স্বভাব সুন্দর শরীরের কান্তি দ্বিগুণতর বাড়াইয়া তুলিয়াছে। এমন সময়ে এমন মূর্ত্তি দেখিলে কাহার হৃদয় না পুতরসে প্লুত হয়? যোগিনীর যেন আজ মহা সাধনায় সিদ্ধির দিন উপস্থিত। আনন্দময়ীকে যেন সে আজ্জ মোক্ষবলে এই স্থানেই টানিয়া আনিয়া তাঁহারই চরণে শেষ আহুতি দিয়া মহাযজ্ঞ সমাপন করিবে।

যোগিনী কিয়ৎক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে কৃষ্ণ মূর্ত্তির ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া হঠাৎ আকাশের পানে চাহিয়া এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।—আর অস্ফুট স্বরে বলিল—"না—আরনা—মা—বিদায়!" এই বলিয়া পার্শ্বস্থিত রজ্জু ও কলস টানিয়া লইয়া কলসের গলে রজ্জু বাঁধিল। পরে নামাবলী গলে দিয়া একবার কৃষ্ণমূরতির সম্মুখে সষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। এইরূপে প্রায় ১০।১২ মিনিট কাল থাকিয়া পরে উঠিয়া বসিল। চক্ষু হইতে দরদর ধারে অশ্রু বহিতে লাগিল। আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া একবারেই দাঁড়াইয়া উঠিল। কিন্তু কি ভাবিয়া একটু চমকিত ভাবে যেন আবার বসিয়া পড়িল। আবার ঠাকুরকে করযোড়ে অস্ফুট-স্বরে বলিল "দেবতা! আবার কেন অন্তর আলোড়িয়া তুলিলে? আবার কেন অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে বলিয়া উঠিলে—'আত্মহত্যা মহাপাপ?'—'আত্মহত্যা মহাপাপ', তাহা আমি জানি, কিন্তু সতীত্ব দান যে মহত্বর পাপ। মহত্বর পাপের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত মহাপাপ করিব তাহাতে ক্ষতি কি? শাস্ত্রে বলে আত্মঘাতীর মুক্তি নাই—ঠিক—কিন্তু অসতীর কি মুক্তি আছে? স্বামীই সতীর ধন, স্বামীই স্বর্গ—স্বামীই ঐশ্বর্য্য—স্বামী জীবনের সাথী—মরণেও সাথী—সেই স্বামী ও যখন আজ হতভাগিনীর বিপক্ষ তখন আর সংসারে বাঁচিয়া লাভ কি?

বাল্যকালে মার মুখে সাবিত্রীর কথা শুনিয়াছি—সীতার কথা শুনিয়াছি,—বেহুলার কথা শুনিয়াছি—তাঁরা সতীত্ববলে মৃত স্বামীকে পুনর্জীবিত করিয়াছেন—তাঁরা সতীত্ববলে দেবতা দর্শন পাইয়াছেন—সতীত্বের এত গুণ এত ক্ষমতা! আর অসতীর পদে পদে লাঞ্ছনা—পদে পদে অপমান, ইহাও দিন দিন দেখিতেছি। ঠাকুর, ইহা তোমার—এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া তাঁহার দুই হাত ধরিয়া ফেলিল। রমণীও বজ্র গম্ভীর নিনাদে বলিয়া উঠিল—ছেড়েদে ছেড়েদে পাপিষ্ঠ। নতুবা এখনি পদাঘাতে তোর শির বিচূর্ণিত করিয়া তোর রক্তেই ঠাকুরের চরণ ধোয়াইব। দেখেছিস সম্মুখে ঠাকুর বিদ্যমান। এখন ঠাকুর আমার শরীরে শত মত্ত মাতঙ্গের বল দিয়াছেন—তোর মত শত শত পাষণ্ডকে এখন এক পদা-

ঘাতেই বিচূর্ণিত করিতে পারি। সতীদ্রৌপদীর মান রক্ষার জন্য ঠাকুর কি করেছিলেন, তুই বোধ হয় তাহা জানিস্।” বাধা দিয়া পাষণ্ড বলিল “মানিনি! তুমি যাহাই করনা কেন আমি তোমায় আত্মহত্যা কর্‌তে দেবনা। আমি তোমার সব কথা শুনিয়াছি। তুমি আগে আমাদিগকে হত্যা কর, পরে আত্মহত্যা করিও। আমাদের বর্ত্তমানে তোমার আত্ম-হত্যা যে একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিবে। মানিনি! চল বাড়ী ফিরে যাই। তখন রমণীর রণরঙ্গিনী বেশ, আলুলায়িত-কেশ, সঘন কম্পিতা ভীষণ আকৃতি। আবার জোরে বলিয়া উঠিল, “ছেড়ে দিবিনা পাপিষ্ঠ! তবে দেখ্” এই বলিয়া জোরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া কলসীটী হঠাৎ তাহার দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া ঝাঁপ দিয়া পুকুরে পড়িল, পড়িয়াই সাঁতারদিতে আরম্ভ করিল। পাষণ্ড চীৎকার ছাড়িল। বলিয়া উঠিল, “দীনেন্দ্র! আসামী ধরা পড়িয়াছে —শীঘ্র আইস—পলাইয়া যায়।” এই বলিয়া সেও ঝাঁপাইয়া জলে পড়িল। রমণী ইত্যবসরে একবার ডুব দিয়া পুকুরের পশ্চিম পারে গিয়া উঠিল। ঐখানে জলের উপর ফুল গাছের কয়েকটা শাখা পড়িয়াছিল। অগত্যা অনন্যো-পায় হইয়া সেই ডালের নীচেই চুপি চুপি আশ্রয়লইল। কিন্তু পাষণ্ডের হাত এড়ায় এমন সাধ্য কোথায়? কতক্ষণ এদিক ওদিক চাহিয়া পাষণ্ড ঐ ফুল তলার দিকে ছুটিল। রমণী অনন্যোপায়, তাই আবার বজ্রগম্ভীর নিনাদে বলিয়া উঠিল, পাষণ্ড! যদি বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে, যদি প্রাণের জন্য বিন্দুমাত্র মমতা থাকে, তবে দূরে সরে যা, আর এক পদও অগ্রসর হস না। আমি সতী ললনা, সতীর অঙ্গস্পর্শে পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধনের কি অবস্থা হয়েছিল, তাহা বোধ হয় তুই জানিস—সাবধান, সাবধান, এখনো ধর্ম্ম লুকায় নাই এই দেখ স্বয়ং ঠাকুর আমার হাতে বর্ত্তমান—এই বলিয়া কৃষ্ণ মূর্ত্তিটী তাহার দিকে তুলিয়া ধরিল, কারণ রমণী বুঝি ভাবিয়াছিল ইহাতেই তাহার কার্য্য সিদ্ধি হইবে; কিন্তু কিছুই হইল না। সাঁতার দিয়া যুবক প্রায় তাহার নিকটে পৌঁছিল, এমন সময়ে অনন্যোপায় হইয়া ব্যাকুলা রমনী আত্মরক্ষার জন্য একটু নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করিল, হঠাৎ এক মুষ্ঠি কাদা লইয়া পাষণ্ডের দুই চক্ষের দিকে ছুড়িয়া ফেলিল। চোখে কাদা পড়িবামাত্রই পামর “মা—মা” চীৎকার ছাড়িয়া জলে পড়িয়া গেল। এই চীৎকার করুণাময়ী রমণীর অন্তঃস্থল স্পর্শ করিল। সে কিয়দ্দূর গিয়া থমক খাইয়া দাঁড়াইল এবং পাষণ্ডের সাহায্যার্থে ফিরিয়া আসিবার উপক্রম করিল। দুই-এক পা আসিতে না আসিতেই দেখিল পাষণ্ড কোন রকমে কূলে উঠিয়া চোখে দুই হাত দিয়া ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে ছুটিয়াছে। তাই রমণী ফিরিয়া দ্রুতগতিতে বাড়ীর দিকে ছুটিয়া পলাইল।

(২)

প্রিয় পাঠকবর্গকে কিছু পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বলিয়া এই রমণীর পরিচয় দেওয়া দরকার। অনুগ্রহ পূর্ব্বক ধৈর্য্যচ্যুত হইবেন না।

বিল্বপুর গ্রামে অনেক ভদ্র লোকের বাস। কিন্তু শিক্ষিতের সংখ্যা বড়ই কম—। গাঞ্জিকা-সেবী মদ্যপায়ী যণ্ড-যুবকের দলই এই গ্রামের উল্লেখ-যোগ্য। তাঁহারা না করিতে পারেন এমন কাজ নাই। সামান্য শিক্ষিত বা অর্দ্ধ-শিক্ষিত প্রৌঢ় যাঁহারা আছেন তাঁহাদেরও

অবস্থা প্রায়ই তথৈব। এই গ্রামের এক প্রান্তে হরেকৃষ্ণ ঠাকুরের বাস। হরেকৃষ্ণ মৃত্যুকালে পুত্রগণকে যথেষ্ট সম্পত্তি দিয়া যান। মধ্যম পুত্র পিতার মৃত্যুর ১৫ দিন পরে তাঁহার অনুসরণ করেন। বড় ও ছোট দুই পুত্রই এখন সংসারের অধিকারী। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম মহেন্দ্র নাথ,বয়স ৩০ বৎসরের বেশী নয়। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম আরুনিক—বয়স ২৫ বৎসর। মহেন্দ্র নাথ বড়ই ধর্ম্মভীরু। কিন্তু আরুণিকের স্বভাব তাঁহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই তিনি আরুণিকের উপর একটু রুষ্ট ছিলেন। আরুণিক তাঁহার জন্যই স্বেচ্ছায় চলিতে না পারিয়া অগত্যা তাঁহাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। যাহা হউক পিতার মৃত্যুর ৪ বৎসর পরে কনিষ্ঠের দুশ্চরিত্রে জ্বালাতন হইয়া মহেন্দ্র নাথ স্ত্রী-পুত্র লইয়া কাশীবাসী হইলেন। পিতার সমস্ত সম্পত্তি এক প্রকার আরুণিকের অধিকারেই আসিল।

এ জগতে অর্থ ই যত অনর্থের মূল। অর্থের সঙ্গে সঙ্গে গর্ব্ব আসিয়া পড়ে। আবার পতন, গর্ব্বের অনুগামী। সুতরাং অর্থ ই মর-জগতে অমরত্বের পথের এক বিষম প্রতিবন্ধক। উহা ভিন্ন ভিন্ন জনকে ভিন্ন ভিন্ন পথে পরিচালিত করিয়া প্রত্যেকের নরকের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়। মনুষ্যকে বিষম চিন্তায় বিজড়িত করিয়া কেবল অর্থের মোহিনী-মায়ায় ভুলাইয়া রাখে, ভগবানের দিকে বৎসরেও একবার দৃক্‌পাত করিতে দেয় না; কাহাকে কাহাকে বিষম বিলাসিতার পথে পরিচালিত করিয়া জগতে পাশবিক কার্য্যে নিযুক্ত করায়। তাই বলিতেছিলাম—অর্থ ই যত অনর্থের মূল। আমাদের আরুণিকও এই অর্থ বলে ঘোরতর বিলাসী হইয়া উঠিল। ক্রমেই পূর্ব্ব-বর্ণিত যুবকের দলের প্রধান মেম্বর হইয়া পড়িল। ঐ দল হইতে আবার আরুণিক ৫ জন মেম্বরকে আপন মনের মত করিয়া বাছিয়া লইল। তাহারা ৬ জনেই একখানা ভিন্ন দল গড়িয়া বসিল। তাহারা ধর্ম্মের ভান করিয়া তান্ত্রিক বলিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করিতে লাগিল। তাহাদের নাম—দীনেন্দ্র নাথ, হেমচন্দ্র, হরিশ কুমার, জয়ন্ত কুমার, ও ভুবন মোহন, আরুণিক। দীনেন্দ্রনাথ ইহাদের মধ্যে প্রধান। আরুণিক প্রভৃতি ইহাকে গুরু বলিয়া মানিত।

যুবকদলের মধ্যে তাহারাই অগ্রণী হইয়া উঠিল। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ ১২ ঘণ্টা তাহারা এই দলের উন্নতিকল্পে কাটাইত। টাকা পয়সা প্রায় আরুণিকের সিন্দুক হইতেই যাইত। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া তাহারা বড়ই দুর্ব্বৃত্ত হইয়া উঠিল। মদ্যই তাহাদের জলের পিপাসা নিবারণ করিত, গঞ্জিকাই তাহাদের হতাশ পরাণে আশার সঞ্চার করিয়া দিত, আর স্বর্গের নন্দন কানন সম্মুখে দেখাইয়া দিত। ক্রমেই দেশে চারিদিক হইতে টিটকারী পড়িতে লাগিল। ১০।১২ দিন অন্তর দেশে এক এক খানা ঘরও জ্বলিতে লাগিল। জোর জবরদস্তিতে অনেক কাজই চলিতে লাগিল। দেশের বড় লোকগণ আর অধিক দিন এই সকল সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদের মধ্যে আরুণিক ও দীনেন্দ্র নাথকে ডাকিয়া অনেক ভয় দেখাইলেন এবং তাঁহারা নিজেরাও যে ভীত না হইলেন এমন নয়। যাহা হউক দেশের উৎপাত কিঞ্চিৎ কমিল। আরুণিক এবং তাহার দলস্থ সকলে এইবার সাধারণে

প্রকাশ করিয়া দিল যে, তাহারা তান্ত্রিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। এই তান্ত্রিকতার ভান করিয়া তাহারা ক্রমেই গুরুতর অন্যায় পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

হায়! আজ ভোগ-মোক্ষের নিদানভূত তন্ত্রশাস্ত্র যাহা মাতৃভক্ত জীবের একমাত্র উপায়, আজ মূর্খ পাষণ্ডগণের নিকট তাহার পরিণতি দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়। তাহাদের কার্য্যের পরিচয় দিতে শরীর শিহরিয়া উঠে, ভাষা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, লেখনী চলে না। কিন্তু স্বীয় উদ্দেশ্য-সাধনের নিমিত্ত বাধ্য হইয়া কিছু লিখিতে হইল। তাহাদের মতে মদ্যই যোগ-সাধনের একমাত্র সহায়—তান্ত্রিকতার প্রধান অঙ্গ। যে যত অধিক মদ্য সেবনে সক্ষম হইবে, সে ধর্ম্ম পথে তত অধিক অগ্রসর হইবে। আরুণিকের বাটীই তাহাদের সম্মিলনী স্থল হইল। প্রত্যেক ২।৩ দিন অন্তর তাহারা তথায় সম্মিলিত হইত। গৃহমধ্যস্থলে একখানা টেবিল ও চারি ধারে ৬ খানা চেয়ার রাখিয়া তাহারা উহাকে চক্র নামে অভিহিত করিল। সেই খানে সম্মিলিত হইয়া প্রত্যেকে এক এক খানা চেয়ারে বসিত ও মধ্যে টেবিলের উপর যথেষ্ট পরিমাণে মদ্য ও অন্য সখের খাদ্য সামগ্রী থাকিত। আর পাশবিক, পৈশাচিক অত্যাচারের জন্য একটা যোগিনী তাহাদের সম্মুখে রাখিতে হইত। উঃ—ধর্ম্মের ভানে এত অত্যাচারও পৃথিবীতে বর্ত্তমান। তবে কৃমি-কীট-সঙ্কুল-নরকও এইরূপ দৈত্যের আবাস ভূমি পৃথিবীতে প্রভেদ কি? ধর্ম্মরাজ! ঘোর কলি উপস্থিত দেখিয়া কি তুমিও আজ পাপীর ভয়ে পলাইয়া রহিয়াছ? প্রত্যেকে শাস্তি দিয়া এখন পাপীর বিনাশ-সাধন তোমার কর্ত্তব্য নয়? ছি ছি এইরূপ কত ধর্ম্মদ্রোহী মূর্খ যে হিন্দু-ধর্ম্মের উপর চিরতরে কলঙ্ক-রেখা আঁকিয়া রাখিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

পাষণ্ডগণ! তন্ত্রের রহস্য ভেদ করা সহজ বুদ্ধির কাজ নয়। তান্ত্রিকগণ যোগ বলে যাহা করিতেছেন বা করিয়াছেন, তোমাদের মত মদ্যপায়ী যুবকের দল শত জন্ম চেষ্টা করিলেও, উহা করিতে পারিবে না। পাপকে আলিঙ্গন করিতে চাও আনন্দের সহিত কর; কিন্তু ধর্ম্মের উপর দোষারোপ কেন? ধর্ম্মের ভান কেন?

এখন আমাদের পূর্ব্বকথিত যোগিনীর পরিচয় দেওয়া কিঞ্চিৎ আবশ্যক। এই রমণী আমাদের আরুণিকের স্ত্রী। বয়স পূর্ব্বেই বলিয়াছি—পঞ্চদশ বৎসর মাত্র। নাম উন্মাদিনী। আরুণিকের পিতার জীবদ্দশাতেই তাহার বিবাহ হয়। উন্মাদিনী চরিত্রে যেন সাবিত্রী, স্বামীই তাহার ধন, স্বামীই স্বর্গ, স্বামীই দেবতা, স্বামীই তাহার সর্ব্বস্ব এই জ্ঞান ছিল। বিবাহের পর আজ ৫ বৎসর পর্য্যন্ত দুঃখই সে জীবন কাটাইয়া আসিয়াছে। মহেন্দ্র নাথের গৃহত্যাগের পর হইতেই তাহার দুঃখের সূত্রপাত। গৃহে এখন একমাত্র গৃহিণী—উন্মাদিনী, আর এক দাসী নাম—বিপুলা। উন্মাদিনীর পিত্রালয় বিষ্ণুপুর হইতে ২ মাইল দূরে অবস্থিত। পিতা নাই মাতা আছেন। ৪ জন জ্যেষ্ঠ সহোদরও বর্ত্তমান। কিন্তু তাঁহারা নিঃস্ব। মহেন্দ্রনাথের গৃহত্যাগের ৪ মাস পরেই আরুণিকের বাটীতে পূর্ব্ব বর্ণিত চক্র স্থাপিত হয়।

এই চক্র স্থাপনের চারি দিবস পরেই

এক রাত্রে আকস্মিক উন্মাদিনীকে বলিল—"উন্মাদিনী, আজ তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে। অবজ্ঞা করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা যদি কর, তবে বলিব, নতুবা নয়।"

উন্মাদিনী—"ছিঃ তোমার কথায় অবজ্ঞা? আমি কি এতই পশু?

আ—"উন্মাদিনী! তুমি আমায় প্রাণের সহিত ভালবাস?"

উ—"তোমার ধারণা কি?"

আ—"আমি এখনো তেমন স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারি নাই।"

উ—"কেন পার নাই? আজ ৫ বৎসরের মধ্যেও যখন তুমি এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পার নাই তবে পরিবে কবে? আমি কি তোমায় কোন দিন ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছি? বল আমি কি কখনো তোমায় অবজ্ঞা করিয়াছি। বল সত্বর বল!"

আ—"না।"

উ—"ইহাতে কি সিদ্ধান্ত হয়?"

আ—"অবশ্য বোধ হয় তুমি আমায় প্রাণের সহিত ভালবাস—কিন্তু—"

উ—"কিন্তু আবার কি? খুলিয়া বল।"

আ—"আজ যদি তুমি আমার একটা কথা রাখ—তবে ঐ সিদ্ধান্তে আসিতে পারিব, এই পরীক্ষার জন্যই তোমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা,—

উ—'বল, কি কথা?"

আ—"আগে প্রতিজ্ঞা কর রাখিবে।"

উ—"না প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে মহাপাপ—আমি ছোট কাল হইতে কোন দিন প্রতিজ্ঞা করি নাই। যদি ইহা আমার পক্ষে অসম্ভব হয় তবে আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে। তাই আমি প্রতিজ্ঞা করিতে পারিব না।"

আ—তোমার পক্ষে যাহা অসম্ভব, এমন কার্য্য করিতে নিশ্চয়ই তোমাকে বলিব না।"

উ—"বেশ, যদি অসম্ভব নয়—তবে প্রাণ দিয়েও উহা করিব, প্রতিজ্ঞা করিলাম।"

আ—"প্রিয়ে—আমি যে তান্ত্রিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছি, তাহা বোধ হয় তুমি জান।"

উ—"হাঁ তুমি ত সে দিন উহা একবার বলিয়াছ।"

আ—"ঐ আমাদের বৈঠক খানায় যে চেয়ার টেবিল প্রভৃতি দিয়া একখানা চক্র সাজাইয়া রাখিয়াছি, তাহাও বোধ হয় তুমি দেখিয়াছ।"

উ—"হাঁ—"

আ—"ঐ চক্রের মধ্যে ২।৩ দিন অন্তর এক একবার বসিয়া আমি ও আমার ৫ জন বন্ধু দীনেন্দ্র নাথ প্রভৃতি যোগ সাধন করিব। উহাতে তন্ত্রের নিয়মানুযায়ী প্রত্যেকে প্রথম যথেচ্ছ মদ্যপান করিবে। তৎপর যোগ আরম্ভ করিবে। কিন্তু ঐ সময়ে একজন স্ত্রীলোক তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতে হইবে।"

উ—(বাধা দিয়া) "মাতৃমূর্ত্তি ধরিয়া—?"

আ—'না—না অন্যমূর্ত্তি ধরিয়া। আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহধর্ম্মিণীকে ঐ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া পর্য্যায়ক্রমে এক এক দিন ঐ উদ্দেশ্যে তথায় উপস্থিত করিব, বলিয়া প্রস্তাব করিয়াছি।"

উ—"বেশ—বেশ—আর বলিতে হইবে না। ঐ প্রস্তাবটি বাদ দিয়া যদি ইচ্ছা হয় প্রস্তাবনানুসারে কাজ করাই বিধেয়। কারণ মদের ঘোরে লোক হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া থাকে, কাজেই—"

আ—"মানিনি ! ঐ প্রস্তাব আমি একলা কিরূপে বাদ দিব ? সকলে আমায় লজ্জা দিবে না ?"

উ—"না—ইহাতে লজ্জার বিষয় কিছুই নাই। তাহারা যদি লজ্জা দিতে চাহেন তাঁহাদিগকে আমার নিকট আনিও—আমি তাঁহাদিগের পায়ে ধরিয়া ঐ প্রস্তাবটী বাদ দিবার জন্য বলিব।"

আ—"তা—হইবে না—তাহারা ইহার পক্ষপাতী হইবে।"

উ—"হয় হইবেন তবে তুমি ঐ কর্ম্মে যাইও না। ঐ উপায়ে ভগবান লাভ বড়ই দুরূহ ব্যাপার বলিয়া মনে হয়।"

আ—"থাক্ তোমার উপদেশ। এখন রাখিবে কি না বল।"

উ—"দেবতা। তুমি আমায় আর ঐ অনুরোধ করিও না। আমায় অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে বল তাহা পারিব, স্বহস্তে হলাহল পান করিতে বল তাহা পারিব, কিন্তু স্ত্রীলোকের অন্যায্য ধর্ম্মে এক পদও অগ্রসর হইতে পারিব না।"

আ—"ইহা আমার বন্ধুগণের ইচ্ছা, তজ্জন্য তোমাকে তাহাদের ইচ্ছা পুরাইতেই হইবে।"

উ—"যাহা বলিয়াছ ওই একবারই—আর ঐরূপ কথা মুখে আনিও না। যদি তুমি ভিন্ন অন্য কেহ এই কথা বলিত, তবে এই মুহূর্ত্তেই তাহাকে উচিত শাস্তি দিয়া বুঝাইয়া দিতাম। পরপুরুষ স্পর্শ করা স্ত্রীলোকের মহাপাপ।"

আ—"আমি ইহা শুনিব না। যদি আমি বাপের বেটা হই তবে আমার বন্ধুগণের ইচ্ছা পূর্ণ করিবই। দেখি তোমায় কে রাখে ? যা পাপীয়সী আমার নিকট হতে দূর হয়ে যা।"

এই বলিয়া একটী পদাঘাত করিয়া উন্মাদিনীকে দূরে সরাইয়া দিল। আজ এই পর্য্যন্তই। ইহাতে উন্মাদিনীর প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। জীবন মরণের ছায়াদ্বয় তাহার চক্ষে ছায়াবাজীর মতই খেলিতে লাগিল। অন্তরে একবার কোপানল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। আবার ধৈর্য্যবারি ছড়াইয়া পড়িয়া উহা নিভাইয়া দেয়। জীবনের শেষ দৃশ্যটুকু বার বার তাহার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিতে লাগিল। কিন্তু সে ধৈর্য্যচ্যুত হইল না। সাহস ও ধৈর্য্যে বুক বান্ধিল। কিন্তু চিন্তানল নির্ব্বাণ করিবে কিসে ? একবার ভাবিল—

"সংসার এত বিষময় ? এই লাল ফল টুকুর মধ্যে এতটুকু গরল ? ছি—ছি মোহান্ধ মানব ! ইহার প্রলোভনে আজ সকলে মুগ্ধ সকলে চেতনা হীন, একবার চোখ্ খোল—বিষে যে সর্ব্বাঙ্গ জর জর হইয়া গেল। ওহো ! এই বিষে বিষাক্ত হয়ে তুমি কিনা করিতেছ ? স্ত্রী হত্যা, নরহত্যা, ভ্রূণ হত্যা যে তোমার বিষ বিজড়িত চক্ষে স্বর্গীয় খেলা বলিয়া মনে হয়। বিপন্নের আর্ত্তনাদ, মদ্যপায়ীর খল্ খল্ হাঁসি যে তোমার অন্তরে স্বর্গের বাজনার ন্যায় বাজে। সতী ললনার সতীত্ব হরণ, দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার, যে তোমার নিকট পূণ্য কেলি বলিয়া মনে হয়। নির্ব্বোধ ! এবিষের পরিণাম কি জান ? মৃত্যুও নয়, যন্ত্রণা—অসহ্য যন্ত্রণা।" আবার ভাবিল—"পাপীত পাপ করিবেই, আমি তাদের হাত এড়াই কি ক'রে ? 'আত্মহত্যা' 'আত্মহত্যা' ইহাই কি একমাত্র উপায় ? ওহো ! কি করি—আত্মহত্যা যে মহাপাপ—আত্মঘাতীর যে মুক্তি নাই—যতদিন চন্দ্র সূর্য্য বর্ত্তমান, যতদিন প্রকৃতি বর্ত্তমান, ততদিন দৈ

আত্মঘাতী ভূত প্রেত হইয়া চারিদিকে কিলি মিলি করিতে থাকিবে। তবে কি করি—কি উপায়েই বা পাষণ্ডের হাত এড়াই—এযে বিষম সমস্যা—জীবন মরণের সন্ধিস্থল। থাক আমি কেন চিন্তা করে মরব. চিন্তাহারীই ত আছেন। তিনিই তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য সম্পাদন করিবেন, আমি ত উপলক্ষ্য মাত্র, তবে আমার আর চিন্তায় কাজ কি?" এইরূপে কত কিনা ভাবিয়া একটু ঘুমাইতে চেষ্টা করিল কিন্তু ঘুম কি আসে? চিন্তা থাকিয়া থাকিয়া দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে আবার ক্ষনেক জন্য একটু নিভিয়া যায়। এইরূপে ওষ্ঠাগত-উন্মাদিনী সেই নিশা কাটাইল।

প্রাতে উঠিয়া আপন কাজে রত হইল, কিন্তু আজ আর সেই উন্মাদিনী নাই, আজ উন্মাদিনী যথার্থই উন্মাদিনী। ২।৩ বৎসর দুর্ভিক্ষের পেষণে বা রোগের যন্ত্রনায় ও এরূপ পরিবর্ত্তন আসিতে পারে কিনা সন্দেহ। আজ তাহার মাধুরীময়ী মুখখানি মাধুরী হারা; চোখের কোণে আজ সেই সরল চাহনি নাই, মৃত্যু-বৈবর্ণ্যই উহার স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে। কেশ বেশ নিতান্ত অসংযত; এক পা অগ্রসর হইতেই আছড়াইয়া পড়িবার উপক্রম, তবুও হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া কোন রকমে গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিল। বিপুলা চোখ মুছিতে মুছিতে দুর্গা দুর্গা বলিয়া বাহির হইল; কিন্তু উন্মাদিনীকে দেখিয়াই অবাক হইয়া দাঁড়াইল। দক্ষিণ করের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখাগ্র কামড়াইতে কামড়াইতে কিয়ৎক্ষণ অধোমুখী হইয়া দাঁড়াইল। ইত্যবসরে কিন্তু সে আকাশ পাতাল ভাবিয়া ফেলিল—পরে হঠাৎ ব্যস্তভাবে উন্মাদিনীর ন্যায় উন্মাদিনীর নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহার নিকট হইতে সম্মার্জ্জনী লইয়া বলিল—"বৌমা, তোমার এখন কাজ রাখ, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে; চল, ঐ ঘরের মধ্যে যাই; আমার দু' একটা কথা শুন,' তারপর কাজ করিতে হয় করিও।" উন্মাদিনীও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে আসিল। একি, দাসী হঠাৎ উন্মাদিনীর পায়ের উপর জড়াইয়া পড়িল কেন? উন্মাদিনী সচকিতে দাসীর মুখ হইতে শুনিল—"মা তোর কি হয়েছে বল্. তোর চেহারা দেখে বোধ হয় যেন তোর অন্তর অনন্ত আগুনে পুড়িয়া যাইতেছে; মা,দাসী বলে লুকোচুরি খেলিস্ না। সত্য ঘটনা আমাকে বল্ আমি প্রাণ দিয়েও উহার প্রতিকারের চেষ্টা করিব" উন্মাদিনীর চোখে জল,কণ্ঠরুদ্ধ বাক্য সরে না। দাসীকে নীরবে হাত ধরিয়া উঠাইল, কি যেন বলিবে বলিবে করিয়াও বলিতে পারিল না—অনেক চেষ্টার পর গদগদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"মা, তুই এখন আমায় মা ব'লে সম্বোধন করেছিস্. আমিও তোকে মা বলিয়া ডাকিলাম। তুই প্রতিজ্ঞা কর আজ হ'তে তুই আমায় তোর স্বগর্ভের সন্তানের ন্যায় দেখবি, যদি তাই করিস্ তবে মনের আবেগ তোর কাছে বলিব নতুবা নয়।" দাসীর চক্ষে বিন্দু বিন্দু জল দেখা দিল, দাসীও গদগদ কণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, "মা, আমিত গর্ভে কোন সন্তান ধরি নাই,আমি এমন কি পুণ্য করিয়াছি যে তোর মত এমন সন্তান পাইব? তবে যদি তুই আগ্রহ করিয়া আমায় মা বলিয়া ডাকিলি তাহা হইলে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, আমার জীবন দানেও তোর মত কন্যার কাজ করিতে ত্রুটী করিব না, ইহাই আমার

"অন্তরের কথা।" উন্মাদিনী এখন কিছু আশ্বস্ত হইল। দুই হাতে চোখ মুছিয়া বলিল—"মা যদি তোর এত সাধ হয়ে থাকে তবে শোন।" এই বলিয়া গত রাত্রের সকল কথাই বলিয়া দিল, কেবল 'বলিলনা পদাঘাতের কথা; পাছে আরুণিকের উপর দাসীর ঘৃণা হয়। আরও বলিল—"মা, যতদোষ দীনেন্দ্র নাথ প্রমুখ সঙ্গীদের, তাঁর দোষ আমি বিন্দুমাত্রও দেখি না; সেই পাষণ্ডেরা যদি এই চক্র স্থাপন না করিত, সেই পাষণ্ডগণ যদি এই প্রস্তাব না করিত, তবে এরূপ জঘন্য প্রস্তাব তাঁহার কল্পনায়ও আসিত না।" বিপুলার চক্ষু রক্তবর্ণ, ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত, মুখের উপর কি একটা ভীতি-প্রদ গাম্ভীর্য্য আসিয়া পড়িয়াছে। স্থির, নীরব, এখনো নীরব, প্রায় ৪।৫ মিনিট কাল উভয়েই নীরবে একে অন্যের পানে তাকাইল। হঠাৎ বিপুলার জলদ গম্ভীর নাদ ঐ নীরবতা ভাঙ্গিয়া দিল; বিপুলা বলিয়া উঠিল—"মা,মা, ভয় নাই —ভয় নাই, সতীর অপমান, ভগবানের অসহ্য; সতীর সতীত্ব রক্ষার জন্য ভগবান নিজেই কর বাড়াইয়া দেন। মা তোমার অলক্ষিতে সেই কর সর্ব্বদা তোমার শিরোপরি বিদ্যমান থাকিবে। আর তাঁহারি ইঙ্গিতে আমায় যদি করাল মূর্ত্তি ধরিতে হয়, তাহাও ধরিব, যদি সতীর সতীত্ব রক্ষার জন্য এ জীবন দিতে হয়, তাতে ক্ষতি নাই।

এই কথার জন্য এত দুশ্চিন্তা? মা, চিন্তা ত্যাগ কর—সোনার শরীরটাকে অকালে ভস্মীভূত করিও না। এই বলিয়া দাসী সান্ত্বনা দেওয়ার পর উভয়ে প্রস্থান করিয়া আপন আপন কাজে নিযুক্ত হইল।

অহো! দাসীর হৃদয়ে কত ক্ষমতা, কত সাহস সতী-ললনার অবমাননার পূর্ব্ব-আভাসে দাসীর অন্তরে কোপানল হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, সতীর করুণ-ক্রন্দনে দাসীর বুক ভাঙ্গিয়া গেল। বিপুলা! তুমি দাসী নও, তুমি নিশ্চয়ই উন্মাদিনীর জননী! ধন্য তোমার দাসী বৃত্তিতে, ধন্য তোমার বীরপনায়!

আজ হইতে আরুণিকের বিষদৃষ্টি উন্মাদিনীর উপর পতিত, কথায় কথায় অবমাননা, কথায় কথায় লাঞ্ছনাই উন্মাদিনীর দৈনিক উপভোগের জিনিষ হইয়া দাঁড়াইল। এইরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল—উন্মাদিনীর উপর স্বামীর অত্যাচারও বাড়িতে লাগিল। শারদীয়োৎসবের কয়েকদিন পূর্ব্বেই এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। পূজার ধুমধামে এই কয়েকদিন তাহাদের চক্র বন্ধ ছিল। ক্রমেই কোজাগর উপস্থিত হইল। প্রদোষে মার পূজা সমাধা হইয়া গিয়াছে। পরে আহারাদির কার্য্যও সমাধা হইয়া গেল। রাত্রি প্রহরেক গতে, আরুণিক উঠানে পায়চারি করিতেছে। উন্মাদিনী দালানের ছাদে বসিয়া চাঁদ দেখিতেছে, আর বিপুলা দালানের মধ্যেই নিদ্রিতা, এমন সময়ে উন্মাদিনী হঠাৎ দেখিল—একদল লোক আসিয়া আরুণিককে ঘেরিয়া ফেলিল। দেখিয়াই তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল—কেন জানিনা। পরে হুড়াহুড়ি করিতে করিতে তাহারা বৈঠকখানার দিকে ছুটিল। এতক্ষণে উন্মাদিনী বুঝিল উহারাই ঐ পাষণ্ডের দল। দীনেন্দ্র নাথকে উন্মাদিনী আরুণিকের সঙ্গে আরও অনেকবার দেখিয়াছে। তাহাকে দেখিয়াই সে তাহাদের দলের পরিচয় পাইল। উন্মাদিনীর অন্তরের চিন্তাস্রোত ফিরিল। বুক অধিকতর কাঁপিতে লাগিল। বৈঠকখানা ও দালান পাশাপাশিই

অবস্থিত। দালানের উপর হইতে বৈঠকখানার ভিতর পর্য্যন্ত বেশ দেখা যায়। কাজেই উন্মাদিনী ছাদের উপর হইতে তাহাদের দিকে লক্ষ্য রাখিল। তাহারা বৈঠকখানায় বসিয়াই কথা আরম্ভ করিয়া দিল। অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ তাহাদের কাহারও মুখে উন্মাদিনীর নাম উচ্চারিত হইল। উন্মাদিনী চমকিত হইল। মনও সেই দিকে ফিরাইল।

দীনেন্দ্র নাথ বলিল—আরুণিক তোর কিছুমাত্র পুরুষত্ব নাই। যদি আমার স্ত্রী আজ আমার কথার বাহির হইত, তবে তাহাকে সেই মুহুর্ত্তেই বাড়ীর বাহির করিয়া দিতাম। স্ত্রীলোকের কি সাধ্য যে পুরুষের কথার বাহির হয়, বিশেষতঃ স্বামীর কথার। ভগবান তাহাদিগকে আমাদের খেলার পুতুলির ন্যায় করিয়া গড়িয়াছেন বইত নয়।"

আরুণিকের মুখ ফুটিল, সে বলিল—'ভাই তোরা যতই বলিস না কেন আমার তেমন কিছুই দোষ নাই। ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে বাস্তবিকই ভয় হয়। সে আমাকে ধর্ম্মের দোহাই দেওয়া মাত্র আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইল—ধর্ম্মের ছায়া মনে পড়াতে মন বড়ই ভীত হইল।

দীনেন্দ্রনাথ একটু হাসিল; তাহার হাসি দেখিয়া সঙ্গীগণও ঐ হাসিতে একটু যোগ দিল, এইবার দীনেন্দ্রনাথের চাতুরী আরম্ভ হইল—"আরুণিক ধার্ম্মিকপ্রবর, ধার্ম্মিক চূড়ামণি! তুমি এই ধর্ম্মের আভাস হঠাৎ কোথায় পাইলে? আগেত তোমার মুখে ধর্ম্ম কথাটী একটী মাত্রের জন্যও উচ্চারিত হইতে শুনি নাই। বুঝিয়াছি—উন্মাদিনীই বুঝি তোমাকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন। বেশ ভাই? উচিত শিক্ষয়িত্রীই পাইয়াছ। এই স্কুলে আমাদিগকে ভর্ত্তি করিবে কি?"

আরুণিকের মুখ রক্তিম হইয়া আসিল সে মনের আবেগ চাপিয়া রাখিয়া হাসি মুখে বলিল—"ভাই এত চাতুরি কেন? তোমাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। আমার ইহাতে তিলেক আপত্তি নাই।" বাস্তবিকই আরুণিকের মনে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ছায়া যুগপৎ পতিত হইল—কিন্তু অধর্ম্মের জয় হইল। এই উত্তরই তাহারা চাহিয়াছিল। এতক্ষণে তাহারা সফল মনোরথ হইয়া সেই রাত্রেই চক্রে বসিবার প্রস্তাব করিল। এবং উন্মাদিনীকে আনিবার কৌশলও বাহির করিতে লাগিল। এখন দীনেন্দ্র নাথ বলিল—তবে ভাই আজ উন্মাদিনীর পালা। তাহাকে আনিবার ভার আমার উপরই রহিল। প্রথমে তাহার পায়ে ধরিব, পরে হাতে ধরিব, তাহাতেও যদি না হয় চুলে ধরিয়া এইখানে লইয়া আসিব।"

তাহার শেষ কথাটুকু শুনিবামাত্র উন্মাদিনী চমকিয়া উঠিল। এখন হৃদয়ের কম্পনে সমস্ত শরীরই বিকম্পিত হইল! হঠাৎ যেন তাহার শরীরের ভিতর দিয়া এক বিদ্যুৎ বহিয়া গেল। তাই শরীর হঠাৎ ঝমকিয়া উঠিল। পূর্ণশশীর পূর্ণতেজে ক্রমেই কালিমা ছড়াইয়া পড়িল। ক্রমেই চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিল। হৃদয়ে শত শ্মশান চিতা এককালে জ্বলিয়া উঠিল। হৃদয় কাঁপিল, শরীর কাঁপিল সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীও কাঁপিল—এক পা অগ্রসর হইবার সাধ্য নাই? যাহা হউক এখন আর ভাবিবার সময় নাই, যাযজ্ঞো এই মুহুর্ত্তেই

আসিয়া পড়িবে এই ভাবিয়া উন্মাদিনী ত্রস্তভাবে নামিয়া আসিল—পথে কতবার আছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু তবুও থামিল না। ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়া নামাবলী সহ ঠাকুরটী লইল, এবং "মা" বলিয়া বাহির হইয়া আপন উদ্দেশ্যে পুকুরের দিকে ছুটিল। এই সব অতি সাবধানে পাষণ্ডদের অলক্ষিতেই হইল।

দীনেন্দ্রনাথ হেমচন্দ্র ছাদে উঠিল। কিন্তু দেখিল উন্মাদিনী নাই। তখন ৫ জন ৫ দিকেই খুঁজিতে বাহির হইল। আরুণিক দাসীকে জাগাইয়া জিজ্ঞাসা করিল উন্মাদিনী কোথায়? বিপুলা ব্যস্তে উঠিয়া পড়িল, ছাদে গিয়া তন্ন তন্ন করিয়া দেখিল, কিন্তু উন্মাদিনীকে পাইল না। (ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেন্দ্র দাস চৌধুরী।

দশম পরিচ্ছেদ

বিচিত্র বার্ত্তা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পরদিবস শয্যা হইতে উঠিতে সুকুমারের বেলা হইয়া গেল। নিদ্রা ভঙ্গের পর সুকুমার নিজ বাসগৃহের চারিদিকে আবার বেড়াইল, কাহাকেই দেখিতে পাইল না। তখন সে ধীরে ধীরে নিজের শয্যার উপর আসিয়া উপবেশন করিল। গত রাত্রির সকল ঘটনা একে একে তাহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইতে লাগিল। অজিতকুমারের সম্বন্ধের কথা মনে হইবামাত্র সে একটী উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। বেলা তখন দশটা বাজিয়া গিয়াছে।

সুকুমার একবার ভাবিল যে আজ একবার সে স্নেহলতার সন্ধান করিয়া আসিবে। কিন্তু অজিতকুমারের কথায় তাহার মতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় সে এ সঙ্কল্প ত্যাগ করিল। সুকুমার গঙ্গাস্নানের উদ্যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

পথে বাহির হইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে সুকুমার দেখিল যে পথিপার্শ্বে ৪।৫ জন লোক বসিয়া ধুমপান করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মহা তর্কও করিতেছে। সুকুমার ধীর পাদবিক্ষেপে গমন করিতে করিতে তাহাদিগের কথোপকথন শ্রবণ করিতে লাগিল।

একজন বলিতেছে—"যাই বল ভাই, এ এক নূতন কথা। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, সে এক বুঝি। তা নয়, দুটি লোকে যুদ্ধ এ কেমন ধারা কে জানে!"

অপর একজন বলিল,—"তাইত; ডাকাতেরা চিঠী পাঠিয়ে ডাকাতি করে, এ শুনেছি বটে। কিন্তু দুজন কথায় কথায় রাগারাগি করে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করবে, এমন কথা কবে কে শুনেছে?"

তৃতীয় ব্যক্তি বলিল—"ওসব শোনা কথায় কেন কান দিস্? চখের ওপর লড়াই হয় ত বুঝি। আমার ও কথাটা মনে লাগ্‌ছে না।"

সুকুমার কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তাহাদিগের নিকটে গমন করিয়া বলিল, "স্নানে যাইতেছি, একবার তেল-তামাক করিয়া যাই।"

কথাটা শুনিয়া একজন ব্যস্তভাবে বলিল, "এস মহাশয়, এই নাও"—বলিয়া সে কলিকাটি সুকুমারের হস্তে প্রদান করিল। সুকুমার করপুটে কলিকা লইয়া ধূমপান করিতে প্রবৃত্ত

হইল। যে ব্যক্তি সুকুমারকে আহ্বান করিয়া বসাইল, সে তখন বলিল, 'আচ্ছা মশায়। আপনি কিছু শুনেছ, এখানে নাকি কি চিঠি দিয়ে লড়াই হবে?"

সুকুমার যেন বিস্মিত হইয়া বলিল—সে আবার কি?

গঞ্জময় কথাটা রাষ্ট হয়ে গেল, আর আপনি কিছু শোন নি? কাল নাকি দুটি ভদ্দর লোক কথায় কথায় রাগারাগি করেছে, আর বলেছে যে খাঁড়া নিয়ে দুজনে লড়াই করবে।

সুকুমার আরও বিস্মিত হইয়া বলিল, "বল কি! আচ্ছা আমি এর খবরটা নিচ্ছি।" এই বলিয়া সুকুমার চলিয়া গেল। যাইবার সময় আপন মনেই ভাবিতে লাগিল যে এসব গোয়েন্দারই চাল।

ঘাটের অদূরেও সুকুমার শুনিল যে কয়েকজন দোকানদার এই বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতেছে। সুকুমার মনে মনে হাসিতে লাগিল। ঘাটে উপস্থিত হইবামাত্র একজন বেশভূষা সম্পন্ন ভদ্রলোক একখানি ইংরাজী খবরের কাগজ হাতে লইয়া সুকুমারের নিকটে উপস্থিত হইল এবং বলিল, "মশায়, আপনি ইংরাজী পড়িতে পারেন?

"কেন?"

"এই অস্ত্রযুদ্ধের খবরটা পাঠ করুন ত।"

"আমি ত ইংরাজী তেমন জানি না। ঐ নৌকায় একজন কাগজ পাঠ করিতেছেন না? চলুন ঐখানে যাই।

উভয়ে সেই নৌকার নিকট গমন করিয়া অধ্যয়নরত একটী ভদ্রলোককে আপনাদের অভিলাষ জ্ঞাপন করিল। ভদ্রলোকটী হাসিয়া বলিলেন "ব্যাপারটি এদেশে নুতন। এদেশে দুজনে রাগারাগি হইলে গালাগালি করে, বড় জোর একটা মারামারি হয়; কিন্তু ফরাসী দেশে এ রকম রাগারাগি হইলে উভয়ে পরস্পরকে যুদ্ধে আহ্বান করে। একটা সময় নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই সময়ে উভয়ে তরবারি বা বন্দুক লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। এই যুদ্ধ দেখিবার জন্য অনেকে সেখানে উপস্থিত থাকে। তাহার পর যুদ্ধ হয়; একজন অবশ্যই খুন হয়—এই খুনের জন্য অপরকে ফাঁসি যাইতে হয় না, মোকদ্দমাও হয় না।"

একজন শ্রোতা বলিল, "এ ত বড় তাজ্জবের কথা!"

ভদ্রলোকটি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "এখানেও নাকি এই রকম একটা ব্যাপার হইতেছে। গত পরশ্ব নাকি একজন ভদ্রলোক এই গঞ্জে আর একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে রাগারাগি করিয়াছেন এবং শেষে উভয়ে উভয়কে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছেন। এদেশে ত এমন যুদ্ধের রীতি নাই, সেইজন্য আজই গঞ্জে সিপাহী শান্ত্রী আসিবে।"

কথাটা শুনিয়া মাঝিমাল্লারা ভয় পাইল। সুকুমার ও অপর ভদ্রলোকটি "তাইত, এ আবার কি হাঙ্গামা" বলিয়া ফিরিয়া আসিল।

স্নানান্তে সুকুমার গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিল যে একটী অপরিচিত লোক তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সুকুমার আসিবামাত্র লোকটী তাহার হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল। সুকুমার আর্দ্রবস্ত্রেই তাহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। সুকুমার পড়িল,—

"প্রিয় সুকুমার আজ! রাত্রিকালে বাড়ীতে

থাকিও। রাত্রি দশটার সময় আমারই একটী লোক গাড়ী লইয়া তোমার নিকটে যাইবে, তুমি সেই গাড়ীতে উঠিও, সে তোমাকে আমার নিকট লইয়া আসিবে। বিশেষ প্রয়োজন; পত্রে সকল কথা লিখিতে পারিলাম না। ইতি

চিরানুগতা স্নেহ—

পত্রখানি পাঠ করিয়াই সুকুমার চাহিয়া দেখিল যে পত্রবাহক চলিয়া গিয়াছে। সুকুমার নানারূপ ভাবিতে ভাবিতে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিল, পরে যথাস্থানে আহারের জন্য গমন করিল। যাইবার সময় স্থির করিল যে রাত্রিকালে দেখা করিবার প্রয়োজন কি, এখনই প্রেতবনে যাইয়া সে স্নেহলতার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।

বেলা দুইটার পর সুকুমার প্রেতবনের দিকে যাত্রা করিল। পাছে কেহ দেখিতে পায়, সেইজন্য সে গঙ্গার তীর বাহিয়া যাইবার চেষ্টা করিল। গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হইয়াই সুকুমার দেখিল যে ঘাটে তিনখানি নূতন বজরা আসিয়াছে। সকল বজরাতেই সিপাহী ও পুলিশ পাহারা দিতেছে। ব্যাপার বুঝিতে সুকুমারের বিলম্ব হইল না। পূর্ব্বেই খবরের কাগজ পাঠ করাইয়া সুকুমার শুনিয়াছিল যে আজ গঞ্জে পুলিশ আসিবে; ইহারাই যে সেই সকল পুলিশ; সুকুমার তাহা বুঝিল।

যাহা হউক, সুকুমার কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া গঙ্গার তীরে তীরে চলিল; শেষে সুযোগ বুঝিয়া প্রেতবনে প্রবেশ করিল। সেখানে গিয়া দেখিল যে স্নেহলতার গৃহের বহির্দ্বার সেইরূপই অর্গলবদ্ধ। প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া সুকুমার ভিতরে প্রবেশ করিল। চারিদিক অনুসন্ধান করিয়া সুকুমার বুঝিল যে স্নেহলতা এই দুই দিন এখানে আসে নাই। হতাশ হইয়া সুকুমার প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

চারিদিন পূর্ব্বে স্নেহলতার জন্য সুকুমারের মন যেরূপ আকুল হইত, এখন আর তেমন হয় না—অজিতকুমারের মহিনীশক্তির বলে সুকুমারের মতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই জন্যই স্নেহলতার পত্র প্রাপ্তির পরও সুকুমার আর স্নেহলতার জন্য বিন্দুমাত্রও চঞ্চল হইল না। কোন প্রকারে দিনটা তাহার কাটিয়া গেল।

রাত্রি ঠিক দশটার পূর্ব্বে সুকুমার গৃহের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। কয়েক মিনিট পরেই একখানি অশ্বযান তাহার নয়নপথে পড়িল। গাড়িখানি তাহার নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র একব্যক্তি গাড়ির ভিতর হইতে মাথা বাহির করিয়া বলিল, 'আমি আপনার নিকটেই আসিয়াছি।"

সুকুমার বলিল, "কে তোমাকে পাঠাইয়াছে?

"মনিব ঠাকুরাণী—স্নেহলতা।"

"কি জন্য আসিয়াছ?"

"আপনাকে ঠাকুরাণীর নিকট লইয়া যাইতে।"

"কোথায় যাইতে হইবে?"

"সে কথা বলিবার হুকুম নাই

সুকুমার ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "বটে! তুমি ঠাকুরাণীর হুকুম তামিল কর, হুকুমের বাহিরে কোন কাজ কর না।"

"আজ্ঞে, হাঁ।"

সুকুমার মনে মনে বলিল, চালাকি আমার সঙ্গে আর খাটিবে না, আমি অজিতকুমারের চেলা। যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহা আমি জানিয়া লইয়াছি।" প্রকাশ্যে সুকুমার বলিল,

"তবে বাপু তুমি ঠাকুরাণীর নিকটে ফিরিয়া যাও, নূতন হুকুম লইয়া আইস।"

"কি হুকুম বলিতেছেন ?"

"আমাকে কোথায় যাইতে হইবে, তাহা আমি জানিতে চাই।"

একথাটা বলিবার জন্য হুকুম লইয়া আইস, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিব।"

"কিন্তু—"

"ও কিন্তু মিন্তু চলিবেনা বাপু। আমাকে কোথায় লইয়া যাইবে, তাহা আমি জানিতে চাই।" গত রাত্রের ঘটনার কথা সুকুমার তখনও বিস্মৃত হয় নাই; সে ভাবিতেছিল যে একবার এইভাবে অজিতকুমারের হাতে পড়িয়াছি, আবার কি স্নেহলতার হাতেও পড়িব ?

লোকটি গাড়ী হইতেই বলিল" আপনাকে অধিক দূর যাইতে হইবে না। প্রেতবনের নিকটেই আমরা যাইব।"

"তোমার ঠাকুরাণী ত প্রেতবনে নাই।"

"না, তিনি সেখানে নাই, তবে নিকটেই আছেন।"

"বেশ যাইতেছি" বলিয়া সুকুমার গাড়ীতে উঠিল। সুকুমার মনে করিয়াছিল যে গাড়িতে উঠিলে লোকটি অবশ্যই দশ কথা কহিবে, কিন্তু সে কথা কহিল না। তখন সুকুমার বলিল, আজ আমার নিকটে কে পত্র লইয়া আসিয়াছিল ?"

সে ব্যক্তি উত্তর করিল"আমি।"

"পত্রের উত্তর লইয়া গেলে না কেন ?"

"উত্তর আমার কি ?"

"তবে কি সেটা তোমার ঠাকুরাণীর আদেশ নাকি-?"

"আমি এইরূপই জানিতাম।"

"তবু অপেক্ষা কর নাই কেন ?"

"অপেক্ষা করিবার হুকুম ছিল না।"

"আচ্ছা তোমার ঠাকুরাণী কখন ফিরিলেন ?"

"জানি না।"

"কাল তিনি কোথায় ছিলেন ?"

"জানি না।"

"তুমি তবে জান কি ?"

"কিছু না।"

এইভাবের কথোপকথন হইতে হইতে গাড়ী আসিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইল। লোকটি সুকুমারকে বলিল, "আসুন।" সুকুমার নির্ভয়ে একটি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বাড়ীর এক অংশে একটি কক্ষে তাহাকে বসাইয়া রাখিয়া লোকটি চলিয়া গেল। সুকুমার গালে হাত দিয়া বসিয়া নানা কথা ভাবিতে লাগিল। এক একবার তাহার মনে হইল যে স্নেহলতা কি তাহাকে খুন করিবে ? আবার সে ভাবিল, স্নেহলতার কাজ যখন শেষ হয় নাই তখন সে খুন করিবে না। হৃদয়ে বল সঞ্চারের জন্য আবার ভাবিল,অজিতকুমার যাহার সহায়, যমালয়েও তাহার ভয় নাই।

এইভাবে প্রায় আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেলে সেই ঘরের সংলগ্ন একটি দ্বার খুলিয়া গেল— সেই দ্বার দিয়া সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা স্নেহলতা পান চর্ব্বন করিতে করিতে প্রবেশ করিল। রূপার ডিবা ভরিয়া এক ডিবা পান সুকুমারকে দিল। পানের ডিবাটি হাতে লইয়া সুকুমার একবার স্নেহলতার মুখের দিকে চাহিল, ক্ষণেকের জন্য সুকুমারের সব গোল হইয়া গেল।

স্নেহলতা সুকুমারের অবস্থা বুঝিয়া কোমলকণ্ঠে বলিল, "কই সুকুমার, আমি কত যত্ন

করিয়া স্বহস্তে পান সাজিয়া আনিলাম, তুমি ত মুখেও দিলে না।”

পানের সহিত বিষ আছে কি না, সুকুমার তাহাই ভাবিতেছিল। স্নেহলতার কথা শুনিয়া সুকুমার এক চাল চালিল। একটু ক্রোধের ভাব প্রকাশ করিয়া সুকুমার বলিল, “এত আদর করিবার কোন প্রয়োজনই নাই, আমাকে কেন আসিতে বলিয়াছ?

স্নেহলতা সুকুমারের আরও নিকটবর্ত্তিনী হইয়া বলিল, “একি কথা কেন, তুমি কি আমার উপর রাগ করিয়াছ?”

গম্ভীরভাবে সুকুমার বলিল, ‘করিয়াছি।”

“কেন, কি অপরাধ করিলাম?”

“তুমি আমার সহিত প্রতারণা করিতেছ।”

স্নেহলতা আরও সমীপবর্ত্তিনী হইয়া বিস্মিত-ভাবে বলিল,“প্রতারণা” সে কি কথা সুকুমার? আমি আপনাকে প্রতারিত করিতে পারি, তবু তোমাকে—প্রতারিত করিতে পারি না। আমি তোমার সহিত প্রতারণা করিব, স্বপ্নেও তুমি এমন কথা ভাবিও না—সুকুমার।”

“তুমি প্রেতবনের বহির্দ্বারে যে পত্র রাখিয়া ছিলে—তাহাতে লিখিয়াছিলে যে তুমি প্রেতবন হইতে চলিয়া যাইতেছ দুই একদিনের মধ্যেই ফিরিবে। কিন্তু আমি তোমাকে প্রেতবনেই সেদিন দেখিতে পাইয়াছিলাম।”

ভুল সুকুমার; আমাকে অন্যত্র দেখিয়া থাকিতে পার, কিন্তু প্রেতবনে দেখ নাই। আমি লিখিয়াছিলাম যে প্রেতবন হইতে যাইতেছি, ত্রিবেণী হইতে যাইতেছি, এমন কথা লিখি নাই। আমি আমার শত্রুর ভয়ে কোনস্থানে ২।৪দিনের অধিক থাকিতে পারি না। এই ত্রিবেণীতেই আমার নানা স্থানে আড্ডা আছে।

“তা থাকিতে পারে। কিন্তু আমি তোমা-কেই প্রেতবনে দেখিয়াছিলাম।”

“তবে হয়ত যে সময় আমি চলিয়া যাই, সেই সময়েই দেখিয়া থাকিবে। যদি দেখিয়া-ছিলে তবে ডাকিলে না কেন? তোমার সহিত দুইটা কথা কহিবার সৌভাগ্যও কি আমার নাই?”

স্নেহলতা যেন কতই দুঃখিতা এইরূপ ভাণ দেখাইল। সুকুমার একটু ব্যথিত হইল। পরক্ষণেই বলিল “আমি তোমাকে ডাকিয়া-ছিলাম, আমার মনে হইয়াছিল যে তুমি ইচ্ছা করিয়াই লুকাইতেছ।”

“ছিছি! এমন কথা মনে করিও না।”

সুকুমার মনে মনে বলিল—একথা সত্য হয় ভালই; আর যদি মিথ্যা হয়, তাহাতেও আর বিশেষ ক্ষতি নাই। প্রকাশ্যে বলিল, “লতা, তুমি কি সত্য সত্যই অজিতকুমারের জন্য কোথাও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারি-তেছ না?”

“সত্য, আমি দিব্য করিয়া বলিতেছি।—সে যাহাই হউক, কোন সংবাদ নাই কি?”

“কি সংবাদ চাও?”

“তুমি কি অজিতকুমারের সহিত বিবাদ করিয়াছ?”

“তুমি একথা কিরূপে জানিলে?”

খবরের কাগজে এইভাবের একটা সংবাদ বাহির হইয়াছে, আমি কাগজ পাঠ করাইয়া জানিয়াছি; ত্রিবেণীর সর্ব্বত্রই আজ এই কথা। আমার ধারণা যে তুমিই বোধ হয় অজিতকুমারের সহিত বিবাদ করিয়াছ।”

“তাই।”

“তবে কি তুমি অজিতকুমারের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধ করিবে?”

"এখন ঠিক বলিতে পারিতেছি না।"

"কেন?"

"কথাটা প্রচার হইয়া পড়িয়াছে। আজ তিনখানি বজরায় সিপাহী পুলিশ আসিয়াছে।"

"তা ঠিক, পুলিশ আমি দেখিয়াছি। তা এক কাজ কর না কেন—ত্রিবেণী হইতে অন্যত্র কোথাও চলিয়া যাও, সেখানে যুদ্ধ করিবে।"

"আমি না হয় যাইব, অজিতকুমার যাইবে কেন?"

"তা যাইবে, সে কাপুরুষ নহে।"

"আচ্ছা লতা, তুমি আমায় ভাল বাস?" সুকুমার একটু হাসিল।

"ভালবাসি—কত ভালবাসি তাহা মুখে আর কি করিয়া জানাইব?"

"এতই যদি ভালবাস, তবে অজিতকুমারের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ম তুমি এত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছ কেন? এযুদ্ধে ত আমার মৃত্যু হইতে পারে।"

ভগবান তা না করুন। নিশ্চিন্ত হইয়া তোমাকে ভালবাসিব, তোমাকে বিবাহ করিয়া সুখী হইব, এই আশাতেই অজিতকুমারকে বধ করিবার জন্ম তোমাকে পাঠাইতেছি।"

সুকুমার আবার হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা লতা, তাহাই হইবে।"

"কোথায় যুদ্ধ করিবে?"

"কলিকাতায়।"

"তুমি কলিকাতায় যাইবে?"

"আমিও যাইব, অজিতকুমারকে অসির নিমন্ত্রণ করিব।"

"কোথায় তাহার দেখা পাইবে?"

"তাহা আমি জানি—তুমি কেবল সময়ের প্রতীক্ষা কর।"

"শুধু সময়ের প্রতীক্ষা নহে সুকুমার; আমিও কলিকাতায় যাইব। শত্রু যে মরিয়াছে, ইহা জানিয়া সেইখানেই আমি তোমাকে বিবাহ করিব।"

"তুমিও কলিকাতায় যাইবে?"

"যাইব, তাহাতে আর ক্ষতি কি?"

"বেশ, তবে এখন চলিলাম।" সুকুমার উঠিল। স্নেহলতার নয়নে একবার বিজলী খেলিল। সুকুমার তাহা দেখিল বটে, কিন্তু তাহার সংকল্প সে ভুলিল না। (ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচুগোপাল মল্লিক।

দুটি তারা।

উদাস বিভল চিতে চাহি নিলাকাশে,
শারদী নির্ম্মল চাঁদ আলো করি আছে।
উজ্জ্বল নক্ষত্র এক তারি পাশে বসে
কত যে প্রণয় কথা চাঁদেরে কহিছে।
ওরি মত একদিন আমারও যে ছিল,
প্রিয়া মোরে প্রীতিভরে কত যে শুনাত।
ওই যে সাঁজের তারা যেমন উজ্জ্বল
তার দুটি তারা-হৃদে অমনি জ্বলিত।
ওই যে মধুর প্রাতে পাখী গায় গান,
আমারও প্রিয়া যে গো অমনি গাহিত।
ওই যে প্রদোষে নদী তুলে মৃদু তান;
অমনি মধুর ভাবে সে যে গো ডাকিত।
এ হৃদয় করি খালি আজি কোথা গেছে,
তার 'দুটি তারা' হৃদে আজো জেগে আছে।

শ্রীলাল গোপাল মিত্র।

ব্যাকুলতা।

(১)

আজি কেন আকুল হেন
আমার হৃদিটী ?
যখন ক্ষিপ্ত প্রভঞ্জনে
বাধায় লড়াই পৃথ্বিসনে
তখন যথা উদ্বেলিত
শান্ত সাগরটী।
আজি কেন আকুল হেন
আমার হৃদিটী ?

(২)

শরৎকালীন আকাশ কোলে
পূর্ণ চন্দ্রটী
বারিদ এসে ঘিরলে পরে,
খিন্ন যথা তাহায় হেরে—
চাঁদের সুধা পানকারী
ফুল্ল চকোরটী।
আজি কেন আকুল হেন
আমার হৃদিটী ?

(৩)

কানন কোলে নৃত্যকারী
স্বাধীন পাখিটী
ব্যাধের ছলে অধীন হয়ে,
মরে যথা ছট্‌ফটায়ে
নিরাশ হয়ে ভাঙ্‌তে নারি
রুদ্ধ খাঁচাটি।
আজি কেন আকুল হেন
আমার হৃদিটী ?

(৪)

দেখা দিলে পূর্ব্বাকাশে
উষার আলোটী
লতার কুঞ্জে কুসুম কোলে
পাপিয়া আর দয়েল মিলে,
গেয়ে গেল প্রাত্যহিক
প্রভাত গীতিটী।
আজি কেন আকুল হেন
আমার হৃদিটী ?

(৫)

দ্বিপ্রহরে মধ্যাকালে
প্রখর রবিটী ;
শূন্যমার্গে তৃষ্ণা-বিকল
ডাক্‌ছে চাতক—দে জল, দে জল ;
স্বন্‌ স্বন্‌ স্বন্‌ স্বন্‌ছে কেমন
ঝাউ তরুটী।
আজি কেন আকুল হেন
আমার হৃদিটী ?

(৬)

সন্ধ্যাকালে ঘরের কোনে
সাঁজের আলোটী।
ঘনায়ে আসে অন্ধকার
গগন কোলে তারার হার ;
ফুলের সৌরভ বিলিয়ে যাচ্ছে
সান্ধ্যসমীরটী
আজি কেন আকুল হেন
আমার হৃদিটী ?

(৭)

আজিও আগের মত
পূর্ণ দিবসটী।
প্রভাত, প্রদোষ, দ্বিপ্রহর,
কুসুম সৌরভ, রবির কর,
মলয় অনিল পাখীর গান
তবু কেন আকুল হেন
আমার হৃদিটী ?

(৮)

পড়লে মনে আকুল হ'তো
যাদের স্মৃতিটী—
দেখ্‌তে তাদের ; আজি তারা
চারিদিকেতে আছে খাড়া ;
পলকহীন নয়ন দু'টী,
মলিন বদনটী।
আজি কেন আকুল হেন
আমার হৃদিটী ?

(৯)

মাতা বসে শিয়রেতে
পদ্ম হস্তটী
ধীরে ধীরে বুলায় শিরে
যাঁর স্মরণে যেতো দূরে
অহংতত্ত্ব শোকতাপ,
ভুলতেম সংসারটী
আজি কেন আকুল হেন
আমার হৃদিটী ?

(১০)

দাই মা'টী পাশে বসে
পুরাণ ঘৃতটি
করছে মালিস বুকে পিঠে ;
খেলা ফেলে এসে ছুটে
কোমল করে টিপ্‌ছে চরণ
ছোট্ট বোনটী,
আজি কেন আকুল হেন
আমার হৃদিটী ?

(১১)

পাশের ঘরে কর্‌ছে সিদ্ধ
স্বামীর পথ্যটী ;
পড়ছে যেন টস্‌ টনাটন্
বিষাদ গীতি— হাড়ের কম্পন ;
থেকে থেকে পদ্মা আড়ে
ব্যাকুল নয়নটী।
আজি কেন আকুল হেন
আমার হৃদিটী ?

(১২)

ভাইরা সব উৎকণ্ঠিত
বিরস বয়ানটী।
পাড়া পড়্‌শী স্বজন জ্ঞাতি
কর্‌ছে প্রকাশ সমানুভূতি ;
পরামর্শ ধরে দিচ্ছে ঔষধ
বাল্য সুহৃদটী।
আজি কেন আকুল হেন
আমার হৃদিটী ?

(১৩)

কবিরেজ মশায় চক্ষু বুজে
টিপছে নাড়ীটী।
মাঝে মাঝে টান্‌ছে নস্য ;
আয়ুর্ব্বেদের টিকা, ভাষ্য
কবেছ চিন্ত, প্রয়োগ কর্‌বে
কোন ঔষধটী।
আজি কেন আকুল হেন
আমার হৃদিটী ?

(১৪)

আজিও তো আগের মত
পূর্ব্ব গৃহটী
মাতা, পত্নী, ভাইবোনে
আত্মীয় আর পরিজনে ;
প্রভেদ শুধু এই যে, আমার
রুগ্ন দেহটী।
আজি কেন আকুল হেন
আমার হৃদিটী ?

(১৫)

আজকে বুঝি আকুল তাই
আমার হৃদিটী ?
থাকিতে তবু, দিবারাতি
চন্দ্রসূর্য্য পবন গতি,
কাঁপে যথা স্থাবর জঙ্গম—
কাঁপলে ধরাটি।
আজি কেন আকুল হেন
আমার হৃদিটী ?

শ্রীদুর্গানন্দ দত্ত।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

মাতৃবিয়োগ।—বিগত ৭ই মাঘ শনিবার আলোচনা সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতৃ বিয়োগ হইয়াছে। তাঁহার জননী প্রায় দুই বৎসর কাল গ্রহিনী রোগে ভুগিতেছিলেন, আজ মাস্যাবধি হইল পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি স্বহস্তে প্রায়শ্চিত্ত চন্দ্রায়ণ কার্য্য সমাধা করিয়া সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিয়াছেন। মৃত্যু সময়ে তাঁহার বয়স ৫৪ বৎসর মাত্র হইয়াছিল, তাঁহার ন্যায় পাকা গৃহিণী আজ কাল হিন্দুর সংসারে খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। যোগীনবাবু ও সুরেনবাবু দুইটী পুত্র এবং দুইটী পৌত্র ও একটী পৌত্রী রাখিয়া তাঁহার স্বর্গারোহণ মন্দ হয় নাই, কারণ "কলির গঙই ধন্য।" তবে মাতৃভক্ত পুত্রগণের এবং পরিবারবর্গের হৃদয়ে যে শোক শেল বিদ্ধ হইল, ভগবান তাহার শান্তি বিধান করুন। সত্বরেই তাহার প্রতিকৃতি সহ পবিত্র জীবনী পত্রস্থ করা হইবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।—উদয়নারায়ণপুরের সুবিখ্যাত, দানশীল, কর্ত্তব্যপরায়ণ জমীদার শ্রীযুক্ত সারদা চরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আলোচনার উন্নতি কল্পে সম্পাদক মহাশয়কে এককালীন ২৫৲ টাকা দান করিয়াছেন; ভবিষ্যতে আরও কিছু সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আমরা সারদাবাবুর ন্যায় ধর্ম্মভীরু জমীদার মহাশয়ের দীর্ঘ জীবন কমনা করি।

উদীয়মান কবিরাজ।—কলিকাতার সুবিখ্যাত সুবিজ্ঞ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিনোদ লাল সেন মহাশয়ের নাম বাঙ্গালাদেশের কে না অবগত আছেন. আজ আমরা যাঁহার নাম আলোচনায় লিপিবদ্ধ করিতেছি, তিনি উক্ত সুবিজ্ঞ কবিরাজ মহাশয়ের পৌত্র এবং আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ, কবিরাজ কুলতিলক আশুতোষ সেন মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র—কবিরাজ শ্রীযুক্ত পুলীন কৃষ্ণ সেন। ইনি পিতা ও পিতামহের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র যথাবিধি অধ্যয়ন করিয়া এক্ষণে পিতা ও পিতামহের কীর্ত্তি তাঁহাদের স্থাপিত আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও ঔষধালয় বজায় রাখিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, ইনি বয়সে নবীন হইলেও চিকিৎসা কার্য্যে সুনিপুণ, বিনয় নম্রতায়ও ইনি পিতৃপথানুবর্ত্তী। ভগবান সর্ব্বতোভাবে ইহাঁকে জয়যুক্ত করুন ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

হোমিওগীতি।—শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইহা একখানি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পুস্তক, সরল পদ্যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, এরূপ বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে যে স্ত্রীলোকেও ইহা সহজে কণ্ঠস্থ করিয়া চিকিৎসা, করিতে পারে। এরূপ গ্রন্থ গৃহী মাত্রেই একখানি কারয়া গৃহে রাখিলে সময়ে লক্ষ টাকার উপকার পাইবেন। মূল্য ১৲ টাকা। ৪নং তেলকলঘাট রোড, হাওড়া, কর্ম্মযোগ প্রেসে প্রাপ্তব্য।

চৈতন্য-লাইব্রেরী।—আমরা এই লাইব্রেরীর ১৯০৮ সাল হইতে ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত কার্য্যবিবরণী প্রাপ্ত হইয়াছি। পাঠে যতদূর অবগত হওয়া যায়, তাহাতে লাইব্রেরীর অবস্থা যে দিন দিন ভাল হইতেছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। দেশের যাবতীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিই ইহার সভ্য শ্রেণীভুক্ত। চৈতন্য-লাইব্রেরী বাঙ্গালা দেশের ও বাঙ্গালা ভাষার অনেক উপকার সাধন করিয়াছে, তজ্জন্য আমরা ইহার অবৈতনিক সম্পাদক বাবু কুঞ্জবিহারী দত্ত এবং গৌর হরি সেন মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

হিন্দুর জাতি ও ধর্ম্ম।

আজকাল আমরা আত্মোন্নতির জন্য পাগল হইয়াছি; কিন্তু জানিনা বা বুঝিনা উন্নতি কাহাকে বলে, উন্নতি কিসে হয়। আমরা আর আমরা নাই—হিন্দুর অনেকেই এখন আর হিন্দু নাই, উন্নতি হইবে কিসে, আর করিবেই বা কে? ধর্ম্মই উন্নতির মূল কারণ, ধর্ম্ম না ধরিলে আত্মোন্নতি নাই। অধার্ম্মিক চিরকালই অবনত; তাহার উত্থানের উপায় কোথায়? ভাই! আর্য্যেরা যে এত উন্নত হইয়াছিলেন—কাহার জোরে,—অধর্ম্মে না ধর্ম্মে? এই আর্য্যবংশাবতংশ হিন্দুজাতির জাতীয়তা, তাহাদের মান, সম্ভ্রম বজায় রাখিতে হইলে ধর্ম্ম ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। ইহাদের ধর্ম্ম, ইহাদের জাতীয়তা একটী অভিনব অসামান্য জাতিধর্ম্ম। ইহাই সনাতন, ইহাই শাশ্বত, ইহাই পুরাতন, ইহাই পবিত্রাদপি পবিত্র। জগতের সকল জাতিধর্ম্ম অপেক্ষা ইহা পৃথক ও অন্যরূপ। সকল ধর্ম্মে প্রবেশ ও বহিস্কার আছে; হিন্দুধর্ম্মে কেবলই বহিস্কার, প্রবেশ নাই। তুমি জর্ডন নদীর জল মাথায় দিয়া অনায়াসে খ্রীষ্টিয়ান হইতে পার, মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হইলে তুমি কল্মা পড়িয়া সে আশা মিটাইতে পার; কিন্তু এইরূপ বা বিভিন্নরূপ কোন একটী পন্থা ধরিয়া অন্য কোন জাতিধর্ম্ম হইতে হিন্দুজাতি কিম্বা হিন্দুধর্ম্মে প্রবেশ করিতে পার না। মনে করিলেই হিন্দু হওয়া যায় না; বহু পুণ্য সঞ্চয় না থাকিলে হিন্দু হওয়া অসম্ভব। হিন্দুর পবিত্র বংশে জন্মগ্রহণ না করিলে তুমি হিন্দুত্বের দাবী করিতে পার না—তুমি হিন্দু হইতেই পার না। হিন্দু ইচ্ছা হইলে খ্রীষ্টিয়ান হইতে পারে—হিন্দু ইচ্ছা করিলে মুসলমান হইতে পারে কিন্তু খ্রীষ্টিয়ান বা মুসলমান হিন্দু হইতে পারে না। ইহাই হিন্দুজাতির ও হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব, এরূপ আর কোন জাতির কোন ধর্ম্মে নাই—কোন ধর্ম্মে থাকিতেই পারে না। খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমান, সংখ্যা বাড়াইবার জন্য এইরূপ করিয়া থাকে—ইহা তাহাদের ধর্ম্ম—জীবনের একটী প্রধান উদ্দেশ্য ও কর্ম্ম। কিন্তু হিন্দু তাহা করে না—তাহাদের উদ্দেশ্যও এরূপ নহে। তুমি হিন্দুর ঔরসে, হিন্দুর গর্ভে জন্মগ্রহণ কর, হিন্দু তোমাকে অম্লান বদনে হিন্দু বলিয়া, ভ্রাতা বলিয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লইবে; কিন্তু কেবলমাত্র সংখ্যা বাড়াইবার জন্য অহিন্দুকে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুজাতি ক্রোড়ে স্থান দিবে না। তুমি সামান্য পাপাচারী হও, প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া হিন্দু তোমায় পুনঃগ্রহণ করিবে, ঘোর পাপাচারী হইলে হিন্দুসমাজ ও জাতিধর্ম্ম তোমাকে বহিস্কৃত করিয়া দিবে, চিরতরে তুমি জাতিচ্যুত হইবে, সমাজে প্রবেশের ক্ষমতা আর তোমার থাকিবে না। ইহাতে সংখ্যায় ক্রমশঃ হ্রাস হইলেও হিন্দু তাহা গ্রাহ্য করে না। হিন্দুধর্ম্ম সংখ্যা দেখে না, দেখে কেবল পবিত্রতা। যদি তাহারা সংখ্যায় বেশী হইবার জন্য, নিজের দলপুষ্টি করিবার জন্য চেষ্টা করিত, তাহা হইলে

মনুষ্যজগতে তৃতীয়াংশের একাংশ বৌদ্ধগণকে আপন অঙ্ক হইতে তাড়াইয়া দিত না। হিন্দু-ধর্ম্ম যদি সংখ্যা দেখিত, তাহা হইলে যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হউক না কেন, তাহাদের কোন না কোন পথ দিয়া আপনার দলভুক্ত করিয়া লইত; কিন্তু হিন্দু তাহা করে না। তুমি কোন প্রকারে পতিত হইয়াছ, কোন প্রকারে তোমার পদস্খলন হইয়াছে; হিন্দুধর্ম্ম তোমাকে ত্যাগ করিবে। তুমি যে ধর্ম্মের বহির্ভূত হইলে হিন্দুর সংখ্যা যে তাহাতে কমিয়া গেল হিন্দুধর্ম্ম তাহা একবারও ভাবিবে না—তাহা গ্রাহ্যও করিবে না। তুমি যত বড়লোক হও না কেন, ধনে, মানে, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে তুমি যত বড়ই হও না কেন—ধর্ম্ম-বিগর্হিত কাজ করিলে হিন্দুজাতি ও ধর্ম্ম তোমাকে ক্রোড় হইতে দূরে নিক্ষেপ করিবে। একজন নিরক্ষর, মূর্খ, সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন, ধর্ম্মভীরু লোককে ক্রোড়ে তুলিয়া তাহার আদর করিবে। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের অভিনবত্ব ও বিশেষত্ব। হিন্দুধর্ম্ম কেবল কতকগুলি অধার্ম্মিক লইয়া দলপুষ্ট করিতে চাহে না—তাহারা চাহে কেবল খাঁটী মানুষ—পবিত্রতার আধার। হিন্দুধর্ম্ম ব্যষ্টি ঠিক রাখিতে চাহে, সমষ্টির ভাবনা তাহার ভাবিবার আবশ্যক নাই। গুঁড়ি ঠিক থাকিলে শাখা প্রশাখার জন্য ভাবনা কিসের?

ধর্ম্ম ঠিক না থাকিলে জাতিও ঠিক থাকিতে পারে না, এই জন্য এখন সমাজে নানা প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা, নানা প্রকার ব্যভিচার আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, দেশময় অশান্তির অনল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিতেছে, দেশবাসী উৎসন্নের পথে অগ্রসর হইতেছে। অন্যান্য জাতি যেরূপ ভাবে উন্নতি করে, হিন্দুর উন্নতি সে ভাবে হইবে না, পাপাচরণে হিন্দুর উন্নতি অসম্ভব; উচ্ছৃঙ্খলতা পরিহার করিয়া ধর্ম্মের পবিত্র পন্থা অবলম্বন করিলে তবে তোমার হিন্দুত্ব বজায় থাকিবে, তুমি আর্য্যের বংশধর বলিয়া সকলের নিকট বরণীয় হইতে পারিবে।

আজ কাল অনেকেই মনে করেন দুই একটা ফাঁকা বক্তৃতা করিয়া লোকের মন নরম করিতে পারিলেই সকল কার্য্য সমাধা হইবে। যাহারা এরূপ ভাবেন, তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। হিন্দুধর্ম্ম কতকগুলি আবর্জ্জনা লইয়া দলপুষ্টি করিবার একান্ত বিরোধী। হিন্দু চায় ধর্ম্ম, চায় পবিত্রতা, ধর্ম্মবলে যতটুকু হয় হউক, অধর্ম্মে রাজ্য প্রাপ্তির আশাও হিন্দু করে না। হিন্দুর জিনিস সবই সাঁচা, ঝুঁটার ধার ইহারা ধারে না। আজ কাল যে এত বিড়ম্বনা, এত লাঞ্ছনা—তাহার কারণ হিন্দুর মধ্যে ভেজাল ভাব আসিয়াছে। তাই ইহাদের দ্বারা হিন্দুর প্রকৃত কার্য্য কিছুই হইতেছে না। ইহার মধ্যে অনেক বাদ সাদ দিলে তবে প্রকৃত হিন্দু, প্রকৃত হিন্দুত্বের ভাব পাওয়া যাইবে। অনেকে হয়ত বলিবেন—উচ্চ-শিক্ষিত, বিলাত প্রত্যাগত কৃতী ভারত-সন্তানগণকে ত্যাগ করিয়া কি দীন-ভিখারী মলিন বস্ত্র পরিহিত, বিনামাশূন্য, চালকলাখেকো, ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ, ন্যায়লঙ্কারকে লইয়া সমাজ-অঙ্গ পরিপুষ্ট করিতে হইবে? আমরা বলিব—হাঁ তাহাই, করিতে হইবে। তাহা না করিলে হিন্দুর আত্মোন্নতির আর অন্য উপায় নাই। দাঁড়াইয়া প্রস্রাবকারী, গোরার বাড়ীর বিস্কুট ভোজী, বিলাত ফেরৎ হিন্দুর দ্বারা আর্য্য সমাজ, ধর্ম্ম ও তাহাদের জাতির কি উপকার হইতে পারে? পাউডার মাখা,

গাউন পরিধারিনী বিবি ছাড়িয়া আমাদের রান্না ঘরের দ্রৌপদী. সংসার কার্য্যে সুনিপুণা শ্যামাঙ্গিনীকেই মাথায় করিয়া বসিতে হইবে, তবেই হিন্দুধর্ম্মের, হিন্দুসমাজের উন্নতি হইবে। আজ কাল তোমরা যাহাকে সভ্যতা বল, আমরা তাহাকে সভ্যতা বলি না। সভ্যতায় মনুষ্যত্বের গঠন হইয়া থাকে, কিন্তু হাল-সভ্যতায় মানুষ গড়িবার উপায় নাই—ইহাতে ধর্ম্মের পথে ও মোক্ষের পথে, যাইতে পারা যায় না। যাহা তোমাকে পরকাল নিস্তারের পথে লইয়া যাইতে পারিবে না, তাহা হিন্দুর নিজস্ব বা করণীয় বলিয়া ধরিতে পারা যায় না। বিজাতীয় ছাঁচে ধর্ম্মভাব বা সভ্যতা লইয়া হিন্দু কখন উন্নতি মার্গে গমন করিতে পারে না। হিন্দুর যাহা আছে—তাহা আর কাহার নাই, কাহার থাকিতে পারে না, থাকা সম্ভবও নহে। আর্য্যজাতির ন্যায়-নিষ্ঠা, ধর্ম্ম ও সভ্যতা স্বতন্ত্র জিনিষ, ইহা কাহার সহিত মিশ খাইতে পারে না।

ভাই হিন্দু! কি করিতেছ; আপনাকে আপনি হারাইয়া ফেলিয়া কেন গোলে পড়িতেছ। তুমি বহু সাধন ফলে হিন্দু হইয়া জন্মিয়াছ, হিন্দু হইয়া হিন্দুর আচার-ব্যবহার, ক্রিয়া কলাপ, শাস্ত্র. লইয়া কাল যাপন কর—তোমার কিছুমাত্র অভাব হইবে না—স্বধর্ম্মে থাকিলে হে হিন্দু! তোমার অভাব কি? অভাবেও তোমার স্বভাব কোন কালে নষ্ট হয় নাই; তোমাকে ত কোন কালে অভাবের পদানত দাস হইয়া হা হতোস্মি করিতে হয় নাই। তবে আজ কেন অভাবে পড়িয়া আপন হারা, জ্ঞান হারা, দিশাহারা, বিভ্রান্ত মতি হইয়া পদস্খলিত হইতেছ? ভাই! কতকগুলি অপূর্ব্ব সত্যের সমষ্টি লইয়া এই হিন্দুধর্ম্ম ও জাতি গঠিত হইয়াছে। ইহার সুশীতল ছায়ায় বসিয়া থাকিলে তোমাকে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে হইবে না, অভাবে পড়িয়া হায় হায় করিতে হইবে না। এই হিন্দু-ধর্ম্মই তোমাকে পূর্ব্বের ন্যায় চতুর্ব্বর্গ দান করিয়া ইহ ও পরকালে পরিতুষ্ট করিবে, তোমার সকল অভাব, সকল ভাবনা ঘুচিয়া যাইবে। আং সং

টাকা!

ধন্য টাকা ধন্য ধন্য,   ত্রিভুবনে তব মান্য,
তব সম কেবা আছে আর।
মরি কি মূরতি হায়,   চক্রাকৃতি রৌপ্যকায়
ঠুন্ ঠুন্ শব্দ কিবা তার॥
তুমি হে সহায় যার,   অসাধ্য কি আছে তার
ত্রিভুবনে সবে তার বাধ্য।
কুরূপ কুৎসিত হয়,   যদি তার টাকা রয়
ভুবন মোহিতে তার সাধ্য॥
রমণীমোহন তিনি.   সুন্দরের শিরোমণি,
রূপে তিনি হন রতি-পতি।
যদি সুরাপান করে,   সুধা পান বলি তারে,
ফুটে উঠে তার যশোভাতি॥
গণ্ডমূর্খ-ষণ্ড হলে,   প্রাজ্ঞ হন অবহেলে,
আখ্যা হয় বিদ্যা-অলঙ্কার।
দেবতা ব্রাহ্মণে হায়,   কভু শির না নামায়,
তবু ভক্তি-রত্নের আকর॥
জন্মদাতার পরিচয়.   "ওল্ডফুল" বলি দেয়,
নাম তার পিতৃ-ভক্তি-মান।
ভাগ্যধর বলি তারে,   সব লোকে সমাদরে,
নির্গুণ হলেও গুণবান॥

"শয্যাগুরু" উপদেশে, ধরেন মায়ের কেশে,
বলে "ওটী দাসী বৈত নয়।"
কেন ওকে দিব অন্ন, তাতে কি বাড়িবে মান্য,
আইনেতে হেন নাহি কয়॥
মত্ত সদা অহঙ্কারে ধরা "সরা" জ্ঞান করে,
বলে কেবা আছে মোর মত।
অভুক্ত আসিলে দ্বারে, অর্দ্ধচন্দ্র দেন তারে,
কুকর্ম্মে সতত রয় রত॥
যে জনের টাকা রয়, তিনি হন সদাশয়,
তার সম সাধু কেবা আর।
সকলি তোমার কীর্ত্তি, শুন হে রজত মূর্ত্তি,
ধন্য ধন্য ধন্য চক্রাকার॥
টাকা নাই ঘরে যার, বাঁচিয়ে কি সুখ তার,
দুঃখ নাহি করে কেহ ম'লে।
টাকা না থাকিলে পরে, কেবা তারে সমাদরে,
হোক না সে কুলিনের ছেলে॥
বিদ্যাবন্ত গুণবন্ত, হউক সে শান্ত দান্ত,
যদি তার টাকা নাহি থাকে।
মূর্খ অহম্মুখ বলে, নিন্দে তারে ভূমণ্ডলে,
রাসভ বলিয়া তারে ডাকে॥
অর্দ্ধাঙ্গিনী হন যিনি, টাকা নাহি পেলে তিনি,
মুখ ফিরায়ে যান হায়! চলে।
যত ভালবাস তায়, সকলি যে বৃথা হয়,
টাকা বিনা মন্ত্র নাহি টলে॥
(বলে) হেন স্বামী থাকা চেয়ে, রহিব বিধবা হয়ে,
সৈতে নারি দুঃখ বারমাস।
টাকা নাহি যার ঘরে, সে কেন বিবাহ করে,
তার কেন সুখ অভিলাষ॥
হায় টাকা বলিহারি, মরি কি গুণ তোমারি;
তোমা বিনা সব অন্ধকার।
পত্নী পুত্র পিতা মাতা, টাকা বিনা কহনা কথা,
ধন্য টাকা তুমি চমৎকার॥
তোমার যত মহিমা, আমি দিতে নারী সীমা,
কলিকালে তুমি ভগবান!
তব লাগি নিশিদিনে, ফিরি আমি নানাস্থানে,
তথাপি যে না পাই সন্ধান॥

শ্রীনগেন্দ্র নাথ দাস ঘোষ।

মৃত্যুর প্রতি।

(To death নামক একটী ইংরাজী কবিতার ভাবানুবাদ)

গোধূলি লগনে যবে, সন্ধ্যা আগমনে,
বিশ্বের আকাশ খানি সাজে নানা সাজে—
মেঘমালা বুকেধরে, স্থির শান্ত হয়ে
কি আশায়, রহে যেন কার প্রতিক্ষায়!
তেমতি আমার মনে জাগে প্রতিদিন
জীবনের ঘনমেঘ, একদিন হায়!
আমার প্রশান্তবুকে আসিবে ঘনায়ে।
তাই ওগো সুখময় মৃত্যুপানে সদা—
চেয়ে রই শিশুসম সতৃষ্ণ নয়নে,
মৃত্যু আসি কবে মোরে লবে কোল পাতি।
মরণ সুখের, জীবিত যেখানে শুধু
ধরনীর বক্ষঃস্থলে মোহ নিদ্রা ঘোরে।
মনে হয়, মরণের পর-পারে আছে
শান্তি, আছে প্রেম, নাহি পশে কোনদিন
সেথা দ্বন্দ্ব, মানবের শত অত্যাচার
মানবের প্রতি। নাহি জানি কে আমারে
লয়ে যাবে সেথা!। ওই যে মেঘের মালা
ঘোরে হেথা সেথা, ওরা কি দেখায় পথ!
ওই যে সোনালী রঙ্গে বিচিত্র চিত্রিত,
শত রশ্মি যায় দেখা পশ্চিম গগণে—
ওরা কি স্বর্গের দূত, সংসারের রণে
ক্লান্ত যত মানবেরে ডাকে অবিরত।

ইঙ্গিতে দেখায়ে দেয় মরণের কুল—
শান্তি-নদী প্রবাহিত, সদা যেই দেশে।
সাধ হয়, ছুটে যাই ত্যজি এসংসার—
সেই সেথা, যেথা নাহি কোন গণ্ডোগোল,
সকলি নিস্তব্ধ যেথা নাহি দিন রাত—
কেবল প্রশান্ত দেশ-উজ্জল আলোকে
অহঃরহ পূর্ণ রহে বিমল বিভায়।
যদিও মায়ার ডোরে বদ্ধ আমি হেথা,
যদিও মৃত্যুর ভয় লাগে ভয়ঙ্কর,
কিন্তু চিরস্থায়ী কেবা হেথা, তাই ডাকি
ওহে মৃত্যু! এসো আজি! দেহ আলিঙ্গন!
সাঙ্গ করে ভব খেলা, লয়ে চিরশান্তি
চলে যাই দূরে ওই স্বরগের পানে;
চাহিনা থাকিতে আর মানবের মাঝে।

শ্রীউপেন্দ্র নাথ দাস বসু।

—–—

পৌষপার্ব্বণ।

১

পৌষ পার্ব্বণের অপভ্রংশ পিঠে পার্ব্বণ। পৌষপার্ব্বণ বা পিঠে পার্ব্বণ বাঙ্গালী মাত্রেরই আনন্দের দিন। সমস্ত বাঙ্গালী এই সময় যথা সাধ্য চেষ্টায় পৌষপার্ব্বণ বা পিঠেপার্ব্বণ সম্পন্ন করে। পৌষপার্ব্বণ লক্ষ্মী পূজার অঙ্গ মাত্র। বাঙ্গালী গৃহস্থ এই দিন মহা সমারোহে লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষ্য করিয়া নানাবিধ সুস্বাদু পিষ্টক প্রস্তুত করে, ও আত্মীয় স্বজনগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করান। ইহা পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিবসে ও মাঘ মাসের প্রথম দিবসে হইয়া থাকে বলিয়া ইহার নাম পৌষপার্ব্বণ বা পিঠেপার্ব্বণ। চরাচর পৌষপার্ব্বণ আনন্দের দিন, কিন্তু আজ একটী হতভাগিনীর পৌষপার্ব্বণের কথা বলিব।

পৌষপার্ব্বণের পাঁচ সাত দিন বিলম্ব আছে, তখন হইতেই উদযোগ আয়োজনের সূত্রপাত চলিয়াছে। বাটীর কর্ত্তা নূতন চাউল, দাইল নারিকেল, তৈল, নূতন খেজুর গুড়, ইত্যাদির উদযোগে ব্যস্ত; গৃহিণী কয় প্রকার পিষ্টক প্রস্তুত করিবে, তাহার নাম করণ চলিতেছে; বালকেরা কে কয় প্রকার পিষ্টক খাইবে, তাহার আলোচনা হইতেছে।

নসীপুরের জমীদার বাবুদের দীর্ঘিকার তীরে এক দল বালক খেলা করিতেছিল। বালক দলের মধ্যে একটী অতি দীন হীন বালক ছিল। তাহার পিতা, মাতা, আত্মীয়, স্বজন কেহই ছিল না। বালক দলের অধিনায়ক জমীদার মহাশয়ের পুত্র বিপিনের দয়ায় উক্ত দীন হীন বালকটী জীবন যাপন করিতেছিল ও পাঠশালায় যাইতে পাইত। বিপিন সচ্চরিত্র ও দয়ালু। তাহার খাদ্য হইতে অনাথ বালকটীকে অর্দ্ধেক দিত এবং কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় ভাল বাসিত।

সকলেই মনের সুখে খেলা করিতেছে, কিন্তু ঐ দীন হীন অনাথ বালকটীর মনে আনন্দ নাই, সে বিরস বদনে খেলা করিতেছিল। বিপিন তাহাকে নিরানন্দ দেখিয়া হৃদয়ে বড়ই আঘাত পাইল। সন্ধ্যা আগমনের সঙ্গে সঙ্গে খেলা সাঙ্গ হইলে বিপিন বলিল—ভাই সব! পৌষপার্ব্বণের দিন আমরা সকলে দুই এক খানা করিয়া পিষ্টক ইহাকে দিব। তাহা হইলেই ইহার পেট ভরিয়া যাইবে ও ইহার পৌষপার্ব্বণ ও করা হইবে। বিপিনের কথায় সকল বালকই স্বীকৃত হইল। অনাথ বালকটীও হাসি মুখে গৃহে ফিরিয়া গেল।

২

আজ বড়ই আনন্দ। আজ পৌষপার্ব্বণ বা পিঠে পর্ব্বণ। তাহার উপর আজ মকর সংক্রান্তি বলিয়া, গুরুমহাশয় পাঠশালার ছুটী দিয়াছেন। আজ বালকদের আনন্দ দেখে কে। বালকেরা মনের আনন্দে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে।

এত হাসি, এত নৃত্য, এত আনন্দ, কিন্তু নসীরাম পুরের মধ্যে একটী ম্লান মুখী বিধবা মনের দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া বসিয়া আছে, এবং মধ্যে মধ্যে চক্ষের জলের সহিত দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। এই রূপ অবস্থায় তাহার পুত্র আসিয়া বলিল "মা খিদে পেয়েছে, কিছু দাও"। কিন্তু হতভাগিনী পুত্রকে কিছুই দিতে না পারিয়া বলিল—বাবা। কি দে'ব, ঘরে কি আছে! কিছুই যে নেই বাবা। বালক বলিল কেন মা, সকলের বাটীতে পিঠে হচ্ছে, আমাকে তাই দাও না। দুঃখিনী চক্ষের জল অতি কষ্টে সম্বরণ করিয়া বলিল,—কোথায় পাব বাবা, আমরা যে দুঃখী, আমাদের কি পিঠে কর্ত্তে আছে? অবোধ বালক বুঝিতে না পারিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। ক্রন্দন করিতে দেখিয়া পুত্রকে ক্রোড় লইয়া মাতা কত বুঝাইলেন কিন্তু নির্ব্বোধ বালক কিছুতেই বুঝিল না, অগত্যা তখন বলিলেন,—বাবা এখন চারিটী ভাত খাও, তাহার পর তোমাকে পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া দিব। পিষ্টক পাইবে এই আনন্দে আহ্লাদিত হইয়া সেই বাসি-ভাত কয়টী ভক্ষণ করিয়া বালক খেলাইতে যাইল।

দুঃখিনী পুত্রকে পিষ্টক দিবে বলিল, কিন্তু গৃহে এক মুষ্টি চাউল পর্য্যন্ত নাই। পূর্ব্বদিন নিজে অর্দ্ধাশন করিয়া পুত্রের জন্য ভাত রাখিয়াছিল। তাহারও প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণ পুত্রকে দিল। অবশিষ্ট যাহা রহিল, তাহা পুত্রের মতন হইবে। আজ হতভাগিনী উপবাস করিবে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া রাখিয়াছিল। হতভাগিনী দুঃখের করাল মূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিল এবং পুত্র আসিলে কি দিয়া সান্ত্বনা করিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল।

ক্রমশঃ মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গেল। ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া দুঃখিনীর একমাত্র পুত্র বাটী আসিয়া মায়ের নিকট যাইয়া পিষ্টক চাহিল। পুত্রের কণ্ঠস্বর শ্রবণে দুঃখিনীর চমক ভাঙ্গিল। সম্মুখে পুত্রকে দেখিয়া হতভাগিনী প্রমাদ গণিল। পুত্রকে সম্মুখে পাইলে মায়ের কত আনন্দ হয়, কিন্তু আজ দুঃখের চরম সীমায় উপনীত হইয়া হতভাগিনী বিষম দায়ে পড়িল। পুত্র নিকটে আসিয়া মায়ের অঞ্চল ধরিয়া "মা পিষ্টক দাও না, বড় খিদে পেয়েছে" বলিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিল। মা, কত বুঝাইল, কিন্তু অবোধ সন্তান কিছুই শুনিল না; তখন হত-ভাগিনী কর্কশ স্বরে বলিল,—"কোথায় পাব।" অজ্ঞান পুত্র বুঝিতে না পারিয়া কহিল,—তুমি যে দে'বে ব'লে ছিলে কৈ দাও না! হত-ভাগিনী বলিল—না দে'ব না, তুই দূর হ'। বালক তিরস্কৃত হইয়া মলিন-মুখে, ছল ছল নেত্রে মায়ের নিকট হইতে সরিয়া যাইল। হতভাগিনী পুনঃরায় গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইল।

৩

এত আনন্দেও আজ নসীপুরের হরিহর মুখুজ্যের বাটীতে নিরানন্দ। তাহার একটী-মাত্র পুত্র দুইখানি পিষ্টকের জন্য মায়ের নিকট তিরস্কৃত হইয়া চলিয়া যাইল। স্নেহময়ী, গর্ব্ব

ধারিণী আজ আর কোন উপায় নাই দেখিয়া চক্ষের জলে গণ্ডস্থল প্লাবিত করিতেছিল। একটী মাত্র সাত বৎসরের পুত্রকে দুইখানি পিষ্টকের পরিবর্ত্তে যথোচিত তিরস্কৃত করিয়া দূর করিয়া দিলেন। একদিন পৌষ পার্ব্বণের সময় যিনি দাস দাসীদের এ পর্য্যন্ত কত প্রকার পিষ্টক খাওয়াইয়া পরিতোষ করিয়াছিলেন, কিন্তু হায়। এমনি কালের কুটিল গতি, আজ নিজ পুত্রকে দুইখানি পিষ্টকের জন্য দূর করিয়া দিলেন। কাল, তোমাকে শত শত ধন্যবাদ।

৺হরিহর মুখুজ্যে নসীপুরের একজন বিখ্যাত বাদান্য ধনী ছিলেন। প্রথম স্ত্রী কোন সন্তানাদি রাখিয়া পরলোক গমন করেন নাই। তাহার পর তিনি পুনরায় দার পরিগ্রহণ করেন। বিবাহের কয়েক বৎসর পরে তিনি একটী পুত্র রত্ন লাভ করেন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার কিছুদিন পরেই তিনি পত্নী পুত্রকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া ইহ লীলা সম্বরণ করেন।

মৃত্যুর পর যৎসামান্য যাহা কিছু ছিল, তাহা তাঁহার শ্রাদ্ধে ব্যয়িত হয়। শ্রাদ্ধের পর অবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল, তাহা কয়েক মাসের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যায়। ৺হরিহর মুখুজ্যে মুক্ত হস্ত ছিলেন। সেইজন্য তিনি পত্নী পুত্রের জন্য কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

৺হরিহর মুখুজ্যের পুত্রের নাম শ্যামধন। শ্যামধন আজ সাত বৎসরের। যখন তাহার দেড় বৎসর বয়স সেই সময় সে পিতৃহীন হয়। পিতৃহীন হওয়ায় শ্যামধন মায়ের নিকট অত্যধিক স্নেহে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সেই কারণ অবশ্যম্ভাবী বড়ই অভিমানী ছিল।

শ্যামধন মায়ের নিকট তিরস্কৃত হইয়া অভিমান ভরে নিম্নতলের একটী আবর্জ্জনা পূর্ণ প্রকোষ্ঠে শয়ন করিয়া রহিল। শ্যামধন মনে করিয়াছিল, মা তাহাকে ডাকিতে আসিবে, কিন্তু শ্যামধন বড়ই ভুল বুঝিয়াছিল। শ্যামধন শয়ন মাত্রেই ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

হতভাগিনী পুত্রকে মলিন মুখে, ছল ছল নেত্রে যাইতে দেখিয়া মর্ম্মাহত হইল। কিন্তু কি করিবে, তিনি কুল-বধূ; কাজেই তিনি পুত্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে, সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল, তত্রাচ পুত্র ফিরিয়া আসিল না। পুত্র না আসায় ক্ষণেক রাগ, ক্ষণেক ভয়, ক্ষণেক উৎকণ্ঠায় সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

* * * * *

সন্ধ্যা হয় হয়, সূর্য্যদেব পাটে বসিয়াছেন; তখনও পুত্রকে না আসিতে দেখিয়া দুঃখিনী, বিধবা পাগলিনীর ন্যায় হইয়া উঠিলেন। কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া তিনি গ্রামের মধ্যে পুত্রের সন্ধানে বহির্গত হইলেন। সকল গৃহস্থের বাটী সন্ধান করিলেন, সকল বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই হতভাগিনীর পুত্রের সংবাদ বলিতে পারিল না। হতভাগিনী পুত্রশোকে ঘোর উন্মাদিনী হইয়া উঠিলেন। নিজের বাটীতে এ ঘর, ও ঘর, সে ঘর; এদিক, ওদিক, সেদিক, চতুর্দ্দিক খুঁজিলেন, কিন্তু বিধবার সম্বল একমাত্র পুত্রকে না পাইয়া পুনরায় গ্রামে যাইলেন। পুত্র-শোকাতুরা, চতুর্দ্দিকে খুঁজিলেন, কিন্তু দুঃখিনীর সর্ব্বস্ব, বিধবার অবলম্বন, কাঙ্গালীর সঞ্চিত ধন পুত্ররত্ন

যে গৃহে শয়ন করিয়াছিল, হতভাগিনী ভ্রমক্রমেও একবার সেস্থানে দেখিলেন না।

মন্দভাগিনীর এতক্ষণ অশ্রুজলে গণ্ডস্থল প্লাবিত হইতেছিল, কিন্তু যখন পুত্রকে খুঁজিয়া পাইলেন না, তখন তিনি ঘোর উন্মাদিনী হইলেন। ক্ষণেক হাসি, ক্ষণেক কান্না, ক্ষণেক চিন্তা, ক্ষণেক আহ্লাদ, ক্ষণেক নৃত্য, ক্ষণেক গীত গাহিতে লাগিলেন, পুত্র-শোকাতুরা এক্ষণে উন্মাদিনী হইলেন। তিনি নৃত্য ও গীত করিতে করিতে, সন্ধ্যার ধূসর মূর্ত্তির মধ্য দিয়া একাকিনী ভাগীরথীর দিকে অগ্রসর হইলেন। ভাগীরথীর কুলু কুলু তানে ক্ষণেকের নিমিত্ত পুত্রশোক ভুলিলেন। পরক্ষণে আবার তাঁহার পুত্রশোক দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। হতভাগিনী পুত্রশোক সহ্য করিতে না পারিয়া ভাগীরথীর প্রশান্ত-ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন। মকর সংক্রান্তির দিন সন্ধ্যার প্রাকালে খোল, করতালি, শঙ্খ, ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে আলুলায়িতকেশা, বিবসনা, পুত্রশোকাতুরা, উন্মাদিনী, হতভাগিনী, ভাগীরথীর পবিত্র সলিলে চিরকালের জন্য পুত্রশোক ভুলিলেন। দুঃখিনীর সকল জ্বালা চিরতরে নির্ব্বাপিত হইল। পাঠক! যে বালকটীকে দীনহীন বেশে দীর্ঘিকাতীরে অপর বালকের সহিত খেলাইতে দেখিয়াছেন—সেই বালক এই হতভাগিনীর পুত্র।

শ্রীমন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায়।

নমস্তে ভারতি!

(গান)

ঝিঁঝিট একতালা।

নমস্তে ভারতি! তুমি জ্ঞানজ্যোতি,
অজ্ঞাননাশিনি! ত্রাহি মা সুতে।
এস বীণাপাণি! মা বিদ্যাদায়িনি!
খুল গো দুয়ার ত্বরিতে॥
ভয়ে কম্পমান, যায় বুঝি প্রাণ,
পাইনা আঁধারে দেখিতে।
ক্ষম অপরাধে, পড়িয়া বিপদে
লইনু শরণ পদেতে॥
মায়ের মতন কে পারে এমন
সুতের বেদনা বুঝিতে!
অধম সন্তানে অধিক যতনে
রাখে মা, প্রবাদ জগতে॥
খুল মা দুয়ার, টে'নেল'ও তোমার
এ'অধম সুতে কোলেতে।
না হ'লে সন্তান, হারাবে পরাণ,
(মা তোর) কলঙ্ক রটীবে তাহাতে॥
(তোর) কি ছিল বাল্মিকী, কালিদাস কি?
করিলে অমর মরতে।
মা গো এ তোমার, করুণা অপার
রটিছে তা'তেই চৌভিতে॥
এ'অধম সুতে, মারিয়া জগতে
কালী কি দিবে মা নামেতে?
খুল মা দুয়ার, টে'নেল ও তোমার
এ'অধম সুতে কোলেতে॥

শ্রীজগবন্ধু চৌধুরী

যোগাভ্যাস।

শ্রীযুক্ত নৃত্য লাল গোস্বামী মহাশয় লিখিত।

নিয়ম।

যোগীকে নিয়মে ও সংযত ভাবে চালনা করিবার শক্তি আছে বলিয়া, যোগের দ্বিতীয় অঙ্গের নাম নিয়ম। শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা,

জাগতিক শোক দুঃখের যন্ত্রনায় বা ভোগ্য বস্তুর বিয়োগে সাংসারিক সকল বিষয়ে অসুবিধার মধ্যে থাকিয়াও সর্ব্বদা আনন্দিত মনে সহাস্য বদনে থাকার নাম সন্তোষ। বোধহয় অনেকে সন্তোষের ব্যাখ্যা অন্য প্রকার করিতে পারেন; কিন্তু আমার বোধ হয় সম-ভাবই 'সন্তোষ"—অর্থের চরম লক্ষ। অসন্তোষে ক্রোধের উৎপত্তি হয় এবং ক্রোধ হইতে সকল প্রকার অহিতকর ও গর্হিত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—"ক্রোধাৎ ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ।" স্মৃতি ভ্রংশাদ বুদ্ধি নাশ, বুদ্ধি নাসাৎ প্রণশ্যতি। সন্তোষি মানবের তৃপ্তি ও শান্তি, শান্তি লাভ করিতে হইলে যোগীকে মনের সন্তোষ সাধন করিতে হইবে। পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা যোগী তপস্যায় পাইতে পারে না। বিষ্ণুপুরাণে ভগবান বলিয়াছেন—তপস্যাই সমস্ত কার্য্যের মূল, দুর্গম, দুষ্প্রাপ্য, দুর্জ্ঞেয় বিষয়ে তপস্যাই মানবকে সিদ্ধিদানে সক্ষম। যথা—"যদ্দুশ্চরং যদ্দুরাপং যদ্দূরং যশ্চ দুস্করম্। সর্ব্বংতত্ত্ব যস্য সাধ্যং তপোহি দুরতিক্রমম॥ তপোমূলং মিদং সর্ব্বং দেবং মানুষকং জগৎ। তপোমধ্যং তপোহন্তং চ তপসাচ তথা বৃতম॥" শাস্ত্র ত্রিবিধ তপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন: শারিরীক, বাহ্নিক, এবং মানসিক। দেব দ্বিজের পূজা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা শারীরিক তপ। অনুদ্বেকর, সত্য ও প্রিয় বাক্য, অধ্যয়ন এবং অভ্যাসের নাম বাহ্নিক তপ, যথা—অনুদ্বেকর বাক্যং সত্যং প্রিয় হিতঞ্চযৎ। সাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥ মানসিক তপস্যা বড় কঠিন; মানসিক তপস্যা পালন করিতে হইলে ভোগ লালসায় জলাঞ্জলি দিতে হয়। মনঃপ্রসাদঃ সৌমত্বং মৌন মাত্ম বিনিগ্রহঃ। ভাব সংশুদ্ধি রিত্যেতৎ তপো মানস মুচ্যতে॥ অর্থাৎ মনের সন্তোষ, সর্ব্বজীবে সমভাব, মৌন আত্ম বিনিগ্রহ ও ভাব সংশুদ্ধি মানস তপস্যা। রিপুগণের ও কামনার বিতাড়নে মানবের মন সদা চঞ্চল রহিয়াছে। সর্ব্বদা সাংসারিক দুঃখ ক্লেশ প্রভৃতির দ্বারা কষ্ট ভোগ করিতেছে। মানসিক তপস্যার দ্বারা সেই চঞ্চল মনকে শান্ত করিয়া ব্রহ্মে স্থির রাখিতে হইবে, সর্ব্বদা নিত্যানিত্য বস্তু বিচারে অনিত্য বিষয়ে বৈরাগ্য আনিতে হইবে। মানসিক তপস্যা রাজযোগের অঙ্গ, বিচার ও বৈরাগ্যের দ্বারা রাজযোগের অধিকারি হওয়া যায়। জন্মজন্মান্তরের বাসনার সংস্কার ক্ষয় করিতে হইলে, তপস্যার দ্বারা পুণ্য সঞ্চার করিতে হয়। সেই জন্য যোগীকে কঠোর তপস্যার সাধনা করিতে শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন।

অধ্যয়নে বুদ্ধি মার্জ্জিত ও তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ হয়। অধ্যয়ন তপস্যার মধ্যে গণ্য। মানব শিক্ষিত না হইলে সমাজ, নীতি ও দেশ সুশৃঙ্খল থাকে না। দেশে উৎশৃঙ্খলতা ব্যাভিচারাদি দোষ ঘটিয়া থাকে ও তাহাতে জাতীয় উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়। সৎশিক্ষালাভ করিতে ও জ্ঞান উপার্জ্জনে অধ্যয়নের বিশেষ প্রয়োজন। যোগীর পক্ষে আত্মোন্নতির জন্য অধ্যয়নের ব্যবস্থা। অধ্যয়নের দ্বারা যোগীকে জাগতীক রহস্য ও আত্মতত্ত্ব লাভ করিতে হইবে।

ঈশ্বর পূজা সকলেরি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কেহ সগুণ বা সাকার কেহ বা নির্গুণ বা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন। সাধকের প্রথম অবস্থায় আকার উপাসনাই প্রশস্ত; কারণ যে কোন উপাস্য মূর্ত্তি এবং তাঁহার

রূপ দর্শনে, গুণ শ্রবণে ও কীর্ত্তনে সেই আপন উপাস্য দেবতার প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হয়, এবং তাহাতে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে, ক্রমে সাধকের নিরাকার ব্রহ্মের ধারণা করিবার শক্তি আসে। তখন সাধকের চিত্তের এরূপ অবস্থা হয় যে ভগবৎ চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা চিত্তে উদয় হয় না, তখনই বুঝিতে হইবে, পূজার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। চিত্তের এরূপ একাগ্রতা সম্পাদন করিতে হইলে আপনার সমস্ত শক্তিই ঈশ্বর পূজায় প্রয়োগ করিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, ইন্দ্রিয় চাপল্য হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া প্রাণের ভালবাসা ও ভক্তির সহিত ঈশ্বর পূজা করা বিধেয়। কেবল বাহ্য আচারে ফল, পুষ্প, জল, তুলসি, চন্দন দিয়া পূজা করিলে ঈশ্বর প্রণিধানের সার্থকতা হয় না। সেই জন্যই বলিতেছি—প্রাণের ভক্তির সহিত ভগবানকে ডাকিলেই ডাকার সার্থকতা লাভ করা যায়। যম ও নিয়মের মধ্যে যে সকল ব্যবস্থা উল্লেখ করা হইল, আশা করি সকলেই সেই সকল নিয়ম পালন বা অভ্যাস করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইবেন।

সত্যলাভের প্রতিবন্ধক।

মনুষ্যের মধ্যে শাস্ত্র, ধর্ম্ম, ইষ্টদেব উপাসনাদি বিষয়ে নানা মত প্রচলিত। এই সকল মতের পরস্পর বিরোধ হইতে হিংসা, দ্বেষ উৎপন্ন হইয়া জগতকে সর্ব্বতোভাবে পীড়িত করিতেছে। অতএব মনুষ্য মাত্রেরই মিথ্যা হইতে বাছিয়া সত্যকে গ্রহণ করা উচিত। তোমরা মনুষ্য, চেতন; তোমাদিগের বুদ্ধি আছে। বিচার করিলে অবশ্যই সত্যকে চিনিতে পারিবে। যেমন চক্ষের গুণ—রূপ দর্শন কর্ণের গুণ—শব্দ শ্রবণ, জিহ্বার গুণ—রসাস্বাদন, সেইরূপ বুদ্ধির গুণ সত্য নির্ব্বাচন। যেমন কোন ব্যাঘাত না থাকিলে সম্মুখের পদার্থ চক্ষু অবশ্যই গ্রহণ করে, তাহার কোন ব্যতিক্রম হয় না, তেমনি ব্যাঘাত না থাকিলে বুদ্ধি অবশ্যই সত্যকে গ্রহণ করিবে, তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে না। সত্য গ্রহণের শক্তির নামই বুদ্ধি। তবে ভ্রান্তি হয় কেন? সংস্কার বশতই ভ্রান্তি ঘটে। কোন ভাব বা পদার্থ বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ না করিয়া উহাকে জানিয়াছি—এরূপ অভিমান বা ধারণার নাম সংস্কার। বুঝিতে পাই আর নাই পাই, পরের মুখে শুনিয়া কোন কথা জানিয়াছি বলিয়া যে দৃঢ় বিশ্বাস, তাহাই সংস্কার। যাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক সত্য জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা পূর্ব্বসংস্কার ত্যাগ করিলেই সত্যকে প্রাপ্ত হইবেন, ইহাতে কোন ভুল নাই। যাহাদের সত্যে প্রীতি নাই অর্থাৎ যাহারা সত্য কি ইহা শুনিয়া তাহার প্রতি বিমুখ, যাহাদের সত্য সম্বন্ধে ঔদাস্য অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যা যাহাই হউক না কেন, ইহাতে আমার কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, সত্যকে জানা নিষ্প্রয়োজন, এইরূপ ধারণাযুক্ত এবং যাহারা সংস্কারের বশীভূত অর্থাৎ সত্যকে না জানিয়া সত্য কে ইত্যাকার ধারণা করে, তাহারা কস্মিন কালেও সত্যকে জানিতে পারে না। বুঝিবার সুবিধার জন্য অপ্রীতি, ঔদাস্য ও সংস্কার এই তিনটি সত্যপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক বলিয়া কথিত হইল, কিন্তু যথার্থ পক্ষে অপর দুইটি সংস্কারের অন্তর্গত। কেননা যাঁহার সত্য উপলব্ধি হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে অপ্রীতি বশতঃ সত্য হইতে বিমুখ হওয়া সম্ভব নহে। যাহার সত্যে ঔদাস্য, তাহার সত্য বা আত্ম-

লাভ সম্বন্ধে বুদ্ধি পূর্ব্বক কোন ধারণা নাই। সংস্কার বশতঃ জগৎ ও সত্য সম্বন্ধে নানা প্রকার ধারণা এবং সেই জন্যই অপ্রীতি ও ঔদাস্য। অতএব সংস্কারই সত্য লাভের প্রতিবন্ধক। সংস্কার লয় হইলেই সত্য আসিবে। কিন্তু সংস্কার বশতঃ যে অভিমান জন্মায় তাহা এরূপ বলবান ও দৃঢ় যে তাহার লয় সাধন বড় কঠিন। অথচ পরমাত্মার অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপের অনুগত হইয়া শান্ত ও ধীরভাবে বিচার করিলে সুখে সত্যলাভ হয়।

সংস্কার বশতঃ মনুষ্য জগতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় গঠন করিয়াছে। যে ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ে নিজের বলিয়া সংস্কার হইয়াছে, অভিমান বশতঃ, তাহার শ্রেষ্ঠতা ও যাহার সম্বন্ধে ঐরূপ সংস্কার নাই তাহার হীনতা প্রচার করিতে মানুষ সর্ব্বদা যত্নবান। ফলে বিদ্বেষ ও হিংসা কর্ত্তৃক সকলেই পীড়িত হইতেছে। কিন্তু মনুষ্য মাত্রেরই বিচার পূর্ব্বক সত্যাসত্য বুঝা উচিত। পরমেশ্বর, গড, আল্লা, খোদা কি হিংসা দ্বেষ বৃদ্ধির জন্য নানা ধর্ম্ম, সম্প্রদায়, ভেক, শাস্ত্র, ইষ্টদেবতা সৃষ্টি করিয়াছেন, না, মনুষ্যগণ নিজ নিজ স্বার্থ সাধনের জন্য ভিন্ন মত কল্পনা করিয়া পরস্পর হিংসা দ্বেষ বশতঃ দুঃখ ভোগ করিতেছে? তোমাদের মধ্যে ঈশ্বর, ধর্ম্ম প্রভৃতি যে সকল নাম প্রচলিত আছে সেগুলি কোন্ পদার্থের নাম, তাহা এক কি অনেক? তোমাদের যতদূর বুঝিবার শক্তি ততদূর পর্য্যন্ত বিচার করিয়া দেখ কি সত্য, কি মিথ্যা এবং মিথ্যাকে ত্যাগ ও সত্যকে গ্রহণ কর।

যদি তোমাদিগকে স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কেহ বলে যে, তোমরা মরিয়া ভূত হইয়াছ বা তোমাদের মাতাপিতা অন্ধ হইয়াছেন, তাহা শুনিয়াই কি তোমরা বিশ্বাস করিবে, না, বিচার করিয়া দেখিবে যে জীবন থাকিতেও কি তোমরা মরিয়া ভূত ও মাতাপিতা দৃষ্টিশক্তি থাকিতেও কি অন্ধ? বুদ্ধি থাকিতেও বিনা বিচারে বিশ্বাস করা অতীব দুঃখের বিষয়। যখন তোমাদের জন্ম হয় নাই, তখন এরূপ সৃষ্টি দেখ নাই এবং জানিতে না যে তোমরা স্ত্রী বা পুরুষ, জ্ঞানী বা মূর্খ, রাজা বা দরিদ্র—কি ছিলে। ঈশ্বর, গড্, আল্লা, খোদা, পরমাত্মা কিম্বা ধর্ম্ম প্রভৃতি এক কি অনেক, দ্বৈত বা অদ্বৈত, জড় বা চেতন, পূর্ণ বা অপূর্ণ নিরাকার বা সাকার, নির্গুণ বা সগুণ, ঈশ্বর, স্বভাব বা শূন্য হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, কবে কে কাহাকে সৃষ্টি করিল ও কবে প্রলয় হইবে, তোমরা ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন—এসকল বিষয়ে তখন তোমাদিগের কোন জ্ঞান ছিল না। যখন মাতার উদর হইতে ভূমিষ্ট হও তখন রাজ্য, ধন বা ইংরাজি, ফার্সি, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা বেদ বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র বা অন্য কোন বিদ্যা সঙ্গে লইয়া জন্মাও নাই। সকলেই মূর্খ হইয়া জন্মিয়াছ। পরে ক, খ, গ, ইত্যাদি এক এক অক্ষর কণ্ঠস্থ করিয়া তবে মৌলবী, পাদরি, পণ্ডিত প্রভৃতি পদ লাভ হইয়াছে। এখনও নিদ্রিত অবস্থায় এ জ্ঞান থাকে না যে, আমি জ্ঞানী, পণ্ডিত, মৌলবী, পাদরি বা মূর্খ, আমি আছি বা ঈশ্বর আছেন, আমি বা ঈশ্বর জড় কি চেতন, দ্বৈত কি অদ্বৈত। জাগ্রতাবস্থা হইলে সংস্কারানুসারে বোধ হয় আমি মৌলবী, পণ্ডিত, পাদরি, জ্ঞানী বা মূর্খ। তখন দ্বৈত অদ্বৈত, সাকার নিরাকার, সগুণ, নির্গুণ, জড় চেতন, স্বভাব শূন্য, পূর্ণ অপূর্ণ,

প্রতিপন্ন কর ও পরস্পর বিরোধ বিতণ্ডা বশতঃ সার ভাব হইতে বঞ্চিত হইয়া সদা অশান্তি ভোগ কর। সত্যকে তোমরা কেহই উপলব্ধি করিতেছ না ; যেরূপ সংস্কার পড়িয়াছে তাহা-কেই সত্য বলিয়া প্রচার করিতেছ। এবং তুচ্ছ স্বার্থ ও অভিমান বশতঃ নিজের সংস্কার সত্য অপরের সংস্কার মিথ্যা, এই ঘোষণা করিয়া সম্প্রদায় পুষ্টি করিতে যত্নবান রহিয়াছ। তোমাদের এখন ত জ্ঞানের গর্বে স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতালে কিছুই অবিদিত বলিয়া বোধ হয় না। এমন কি, গর্ব্বে পরমেশ্বরের সর্ব্বশক্তি পর্য্যন্ত লোপ করিতে সচেষ্ট। কিন্তু সুষুপ্তির অবস্থায় তোমাদের কি জ্ঞান থাকে ? তখন ত কোমরের কাপড়ের পর্য্যন্ত খবর থাকে না। জ্ঞানাভিমানীরা জাগ্রতাবস্থাতেও জানিতে পারেন না, যে কখন্ রোগে শরীর শীর্ণ হইবে বা মৃত্যু প্রাণহরণ করিবে। সকলে প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন—যে স্ত্রীলোক ও অর্থের লোভে কত মহান জ্ঞানী, পণ্ডিত সাধু, সন্ন্যাসীর পতন হইতেছে। ইহা দেখিয়া অন্ততঃ লজ্জার ভয়েও অভিমান শান্ত হয় না ? যখন একজন সামান্য বাজীকরের কৌশলে লোকের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের বিভ্রম ঘটিতেছে, তখন মনুষ্যের কি শক্তি আছে যদ্দ্বারা পরমেশ্বরের অসীম পরাক্রমের সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারিবে ?

লোকে নিজ নিজ সম্প্রদায় অনুসারে বলেন—"পীর, প্যাগম্বর, ঋষি, মুনি, অবতারগণ আমাদের নেতা, আমাদিগকে সত্য দেখাইয়াছেন।" কিন্তু সত্য সম্বন্ধে তাঁহারা নিজে কি জানেন? সকলেরই নিজ নিজ স্বপ্নকে সত্য বলিয়া ধারণা হয়, কিন্তু একজনের স্বপ্ন অন্য জনের সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয় না। পীর, প্যাগম্বর প্রভৃতি যিনি যেরূপ দেখেন বা শুনেন, তিনি সেইরূপ প্রকাশ করিয়া যান। কিন্তু পরমেশ্বর নিত্য, তিনি পূর্ব্বাপর একই ভাবে আছেন, তিনিই সত্য স্বরূপ ও তিনিই সত্যের প্রকাশক।

মনুষ্য বাল্যে যাহা শুনে, যৌবনে তাহা বিশ্বাস করে এবং আমরণ সেই সংস্কারের দ্বারা সত্যকে ঢাকিয়া রাখে। অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদী, নিরাকারবাদী, স্বভাববাদী ও শূন্যবাদী—সকলেরই নিজের সংস্কার সত্য, অপরের সংস্কার মিথ্যা বলিয়া ধারণা। এইরূপ অসৎ ধারণার ফলে হিংসা দ্বেষের জন্য লোকের দুঃখভোগ হয়, সত্য যেমন তেমনই রহিয়া যান। সত্য স্বতঃপ্রকাশ, কাহাকেও প্রকাশ করিতে হয় না, সত্যকে যে চায় সেই পায়। লোকে সত্য চাহে না, এজন্যই সত্য দুর্ল্লভ। অতএব সকলে শান্ত ও গম্ভীরভাবে পরমেশ্বরের অনুগত হইয়া সত্য জানিতে প্রবৃত্ত হও। যাহা আছে তাহা সত্য, যাহা কেবল দেখায় মাত্র তাহা মিথ্যা। এক পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সত্য, তদ্ভিন্ন অপর সমস্তই মিথ্যা। এই যে নানা বিচিত্র পদার্থ দেখা যাইতেছে, ইহারা পরস্পর ভিন্ন ও পূর্ণব্রহ্ম ইহাদের হইতে ভিন্ন—এই ভাব মিথ্যা। এবং ইহাদের সকলকে লইয়া পূর্ণব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বর একই পুরুষ—সর্ব্বকালে যাহা তাহাই বিরাজমান—এই ভাব সত্য। যাহা সত্য তাহা সকলের নিকট সত্য, যাহা মিথ্যা তাহা সকলের নিকট মিথ্যা। যাহা এখন সত্য তাহা চিরকাল সত্য, যাহা এখন মিথ্যা, তাহা চিরকালই মিথ্যা। সত্যই কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল, নানা নাম, রূপ, ভাবে নানা প্রকারে প্রকাশমান। মিথ্যা প্রকাশ পাইতেই পারে না। সকলের মধ্যে একই সত্য প্রকাশমান

দেখিয়া যথার্থ জ্ঞানী পুরুষ যাহাতে সকলেই শান্তি পায়, তাহার জন্য সর্ব্বদাই যত্ন করেন। সত্য বোধ বিনা জ্ঞান নাই, জ্ঞান বিনা শান্তি নাই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরমহংস—শ্রীমৎ শিবনারায়ণ স্বামী।

আচার ও বিচার।

হিন্দু সকল কাজে যত আচার ও বিচার মানিয়া চলে, এরূপ আর কোনও জাতিই চলে না, আচার ব্যবহার এবং তাহার বিচার বিবেচনাই হিন্দুর হিন্দুত্বের নিদর্শন। যাহারা আচার বিচার মানিয়া চলে না, তাহারা হিন্দু নামের অযোগ্য। আচার-বিচার-বিহীন ব্যক্তি কখনই হিন্দুত্বের দাবী করিতে পারে না। ধর্ম্মের অধিকারী হইতে হইলে, ধর্ম্মশিক্ষায় মানব-জীবন পবিত্র করিতে হইলে, প্রথমে আচার ও বিচার করিয়া সকল কার্য্য সম্পাদন করা একান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা তুমি যতই ধর্ম্মের ভাণ কর না কেন—তোমার সকল কার্য্যই পণ্ড হইবে। "আচারে লক্ষ্মী, বিচারে পণ্ডিত" এই অমোঘ বাক্য কেবল হিন্দুই বুঝিত, হিন্দুই তাহা প্রতিপালন করিত বলিয়াই হিন্দুর ঘরে লক্ষ্মী অচলা ছিলেন। তাই ব্রাহ্মণগণ এককালে পণ্ডিতের অগ্রগণ্য হইতে পারিয়াছিলেন। আর্য্য নামধেয় ব্রাহ্মণগণ যে এককালে সকলেরই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতে পারিয়াছিলেন—এই আচার বিচারের প্রতি লক্ষ্য রাখাই তাহার প্রধান কারণ। ব্রাহ্মণগণ আজ এই আচার বিচারে জলাঞ্জলি দিয়াছে বলিয়াই তাহাদের এত দুর্গতি হইয়াছে, তাই তাহারা দিন দিন এত লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতেছে। আজকাল ব্রাহ্মণ কেবল সূত্রধারী মাত্র হইয়াছেন, ব্রাহ্মণ এখন তাহাদের নিজ শ্রেষ্ঠত্ব ভুলিয়া গিয়া শূদ্রোচিত ব্যবহারে অভ্যস্থ হইয়াছে, অম্লানবদনে শূদ্রের সহিত আহার-বিহার করিতেছে, জাতিবিচার ও খাদ্যাখাদ্য বিচার আর এখন তাহারা করিতে চাহে না, কুলীন ব্রাহ্মণগণ আজ বিচার বিরহিত, অনায়াসে পিরু মিয়ার হোটেলে প্রবেশ করিয়া অখাদ্য আহারে উদর পূরণ করিতেছে।

"আচারো বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদান নবধা কুললক্ষণ" আজ কয় জন কুলীন ব্রাহ্মণ এই নয়টী গুণের একটীর দ্বারা ভূষিত দেখিতে পাওয়া যায়? অন্বেষণ করিলে শতাধিক ব্রাহ্মণের মধ্যে একজনেও এই সকল গুণ বর্ত্তমান আছে কিনা সন্দেহ। শিক্ষা দোষে আজ হিন্দু অহিন্দু হইতেছে; আচার ভ্রষ্ট হইয়া বিপথে গমন করিতেছে। শূদ্র আর ব্রাহ্মণকে মানিয়া চলে না। ব্রাহ্মণ আমাদের অপেক্ষা বড় কিসে? ধনে, মানে, কুলে, শীলে, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে আমরা অনেক অংশেই ব্রাহ্মণদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছি—তাই আজ অনেক শূদ্র দ্বিজ নামে অভিহিত হইবার জন্য বা ক্ষত্রিয় হইবার জন্য উপবীত গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না।

শূদ্র যে এরূপ উদ্ধত প্রকৃতি, ব্রাহ্মণের আসন গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়াছে, ইহাও ব্রাহ্মণের দোষে। তাহারা বুঝিয়াছে—এই উপবীত সূত্রটুকুই বুঝি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব,—যদি এইটুকুর জোরে উহারা এরূপ বড় হয়, তবে আমরা হইব না কেন?

আমরাও উঁহাদের অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নহি, বরং কাহার কাহার অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ—এই জন্য আজ তাহারা সূত্রধারণ করিয়া ব্রাহ্মণের সমকক্ষ হইতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু তাহারা যদি দ্বিজগণের সেই অতুলনীয় তপঃ-প্রভাব, সেই অলৌকিক ধর্ম্মভাব চক্ষে দর্শন করিত, সেই অসীম ত্যাগ স্বীকার, সেই ভীষণ কষ্ট সহিষ্ণুতা একবার নয়নগোচর করিত, তাহা হইলে কি তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় দেবতা বলিয়া পূজা করিয়া ধন্য হইত না? এই যে হীনতা, এই যে এত নীচতা, ইহার কারণ কেবল আচার বিচার বিহীনতা। আচার বিচার শূন্য, ধর্ম্মশূন্য ও তপঃপ্রভাবশূন্য হইয়াই ব্রাহ্মণের এত অধঃপতন এবং তন্নিমিত্তই লাঞ্ছনা।

আচার বিচার, অশন বসন, পোষাক পরিচ্ছদ আজ আর হিন্দুর নিজস্ব নাই; কেহ সাহেব সাজিতেছেন, কেহ বা মুসলমান সাজিয়া বাহাদুরী দেখাইতেছেন। কেহ তাহার প্রতিবাদ করিবার নাই। আর প্রতিবাদ করিলে শুনিবেই বা কে? যে যাহা মনে করিতেছে সে তাহাই করিতেছে। এইজন্যই ত দেশে এত অশান্তি, দেশের লোকে এত উচ্ছৃঙ্খল। ইহার প্রতিকারের আর অন্য উপায় নাই। যদি শিক্ষার পরিবর্ত্তন না হয়, হিন্দু যদি আবার আচার-বিচার-সম্পন্ন না হয়, তাহা হইলে দেশে শান্তি স্থাপনের আর অন্য উপায় নাই। হিন্দুকে পুনরায় হিন্দু করিতেই হইবে, আর্য্যের সেই পবিত্র প্রথা অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মপথে চালাইতে পারিলে তবে দেশে আবার সুখের দিন আসিবে, দেশের হাহাকার ঘুচিয়া যাইবে, সকলেই পূর্ব্বের ন্যায় শান্ত ভাবে দিন কাটাইতে পারিবে। আমাদের ইহাই ধারণা। মানুষ যদি জাতিভ্রষ্ট, আচার-ভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা সকল গর্হিত কার্য্যই সম্ভব হইতে পারে। অনেকে হয়ত মনে করিবেন—আমরা ইংরাজী শিক্ষার দোষ দিতেছি; কিন্তু তাহা নহে। ইংরাজ যখন আমাদের রাজা, তখন ইংরাজী আমাদের শিখিতেই হইবে, তবে ইংরাজী শিখিতে হইবে বলিয়াই যে আমার ভাষা, আমার জাতীয় ভাব, আমার অবশ্য প্রতিপাল্য, আচার বিচার ছাড়িয়া নানাপ্রকার গর্হিতাচরণ করিতে হইবে—এ কিরূপ কথা? হিন্দু, হিন্দু-ধর্ম্ম মানিবে, হিন্দু-জাতি মানিবে, তাহাদের স্বধর্ম্মোচিত ক্রিয়া কলাপে দীক্ষিত হইয়া হিন্দুত্ব দৃঢ়রূপে বজায় রাখিতে চেষ্টা করিবে, তাহা হইলেই আবার হিন্দু নাম ভারতে স্বর্ণাক্ষরে প্রতিফলিত হইবে। ইহার ব্যতিক্রম হইলেই যে ক্রমশঃ হিন্দু নাম ভারত হইতে লোপ হইয়া কি এক প্রকার "কিম্ভূতকিমাকার" জাতির সৃষ্টি হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। ভাষা-শিক্ষায় দোষ নাই, তাই বলিয়া যে প্রকৃতিগত আচার বিচার ছাড়িয়া দিয়া পরকালের পথ নষ্ট করিতে হইবে—এরূপ কথার সারবত্তা কোথায়? হিন্দু যেমন আত্মহারা হইয়া নিজের সর্ব্বস্ব নষ্ট করিতেছে, পৃথিবীর আর কোন জাতিই সেরূপ করিতেছে না। আপনার নিজস্ব, চিরাভ্যস্ত ধর্ম্মের প্রতি যাহাদের এত অনাদর—তাহাদের মতিভ্রম ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে।

হিন্দুকে হিন্দু করিতে হইলে—ব্রাহ্মণ ও হিন্দু সমাজ পুনঃ সংস্কৃত করিতে হইবে। হিন্দুকে হিন্দুর ক্রিয়া কলাপে মনোযোগী করিতে হইবে। দেশের যেরূপ দুরবস্থা—তাহাতে এরূপ না করিলে অন্য উপায়ে ইহার প্রতিকার

হইবে না—ইহাই আমাদের বিশ্বাস। এরূপ করিতে হইলে রাজার সহায়তা নিতান্ত আবশ্যক। রাজা যদি পুনরায় জাতীয় শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি করিয়া এই ভ্রষ্টাচারী হিন্দুকে পুনরায় হিন্দুত্বের পথে পরিচালিত করিতে পারেন, আবার যদি হিন্দুকে প্রকৃত সাত্বিক ভাবাপন্ন করিবার কোন নিয়ম প্রচলন করেন, তাহা হইলে রাজায় প্রজায় সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সাত্বিক ভাবাপন্ন হইলে কখন কোন প্রকার পাপাচরণে আর লোকের মতি যাইবে না - ধর্ম্মভাবে দেহ মন পবিত্র হইবে এবং দেশে অন্যায় কার্য্যের প্রসার বৃদ্ধি হইবে না। প্রজা নানা ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া রাজা যেমন কাহারও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন না, অর্থাৎ রাজা কোন ধর্ম্মেরই বিরোধী হয়েন না; তেমনি রাজ-ধর্ম্ম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাগণকে তাহাদের স্ব স্ব ধর্ম্মে প্রবৃত্ত না রাখিলে রাজ্যের অমঙ্গল বলিয়াই বিশ্বাস। প্রজাকে সকল বিষয়ে রক্ষা করা রাজারই কার্য্য। রাজার সহায়তা ব্যতীত প্রজার রক্ষা অসম্ভব। প্রজাদের শিক্ষা বিষয়ে রাজা মুক্ত হস্ত। অজস্র অর্থব্যয়ে নানা প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা যেমন চলিতেছে সেইরূপ জাতীয় ধর্ম্ম আচার ব্যবহার প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিলে দেশে বিকৃত মস্তিকের দলপুষ্টি হইতে পারে না। এদেশে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতির সংখ্যাই অধিক। ইহাদের—ধর্ম্ম আচার, ব্যবহার এবং শিক্ষার যাবতীয় বিষয় অতি প্রসস্তভাবে ব্যবস্থিত রহিয়াছে। নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া ইহাদিগকে কর্ত্তব্যে প্রবৃত্ত করিতে হইবে না। ইহাদের পুরাতন শিক্ষার প্রণালী এবং ধর্ম্ম গ্রন্থাদির প্রচলন করিয়া দিলেই সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।

পীড়া হইলে ঔষধ প্রয়োগ দরকার হয়। প্রথমে রোগ নির্ণয় করিয়া তদুপযুক্ত ঔষধ না দিলে রোগের উপশম আশা দুরাশা মাত্র। বিশেষ বিচার করিয়া দেখিলে এক ধর্ম্ম-শিক্ষার অভাবই যে রাজ্যে অশান্তি আনিয়াছে ইহাই স্থির হইবে। ধর্ম্মপ্রবণ হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্ম-শিক্ষা না পাইয়া আজ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইতেছে ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। অতএব আমাদের রাজার নিকটে ও হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত ধন কুবেরগণের নিকটে সানুনয় প্রার্থনা তাঁহারা একযোগে আপন আপন ক্ষমতানুসারে পূর্ব্ব প্রচলিত ধর্ম্ম-শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেশ রক্ষা করিতে যত্নবান হইবেন।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

পৃথিবীর ইতিহাস। সুপ্রসিদ্ধ লেখক এবং বঙ্গবাসীর অন্যতম ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় আজ "পৃথিবীর ইতিহাস" প্রণয়নে কৃত সঙ্কল্প হইয়াছেন এরূপ গুরুতর কার্য্য দুর্গাদাস বাবুর ন্যায় আজীবন সাহিত্য সেবীর পক্ষেই উপযুক্ত; যাহার প্রণয়নে বাঙ্গালার কোন সাহিত্যসেবীই অদ্যাবধি সাহসী হইতে পারেন নাই। দুর্গাদাস বাবুর বহু অর্থ ব্যয়, গভীর গবেষণা ও অসাধারণ পরিশ্রম এবং ত্যাগ স্বীকার করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের সেই মহৎ অভাব দূরীকরণে প্রয়াসী হইয়াছেন। "পৃথিবীর ইতিহাসের"

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে; দ্বিতীয় খণ্ড সত্বর প্রকাশিত হইবে প্রত্যেক খণ্ড সুবর্ণ-খচিত সুন্দর বাঁধাই প্রায় পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠায় পূর্ণ, মূল্য—৫৲ টাকা যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধাদি রচনা করেন, এই পুস্তক তাঁহাদের নিকটে থাকিলে প্রবন্ধ রচনা বিষয়ে যে বিশেষ সাহায্য হইবে—তাহা বলাই বাহুল্য। যেরূপ প্রণালীতে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে ইহা যে একখানি উপাদেয় এবং প্রত্যেক বঙ্গবাসীর অত্যাবশ্যকীয় গ্রন্থ হইবে, সে বিষয় আর সন্দেহ মাত্র নাই। ইতিমধ্যে এই উপাদেয় গ্রন্থ মারাট্টী, গুজরাটী, কেনারী ও হিন্দি ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভাষান্তরিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতেই পুস্তকের উপাদেয়ত্ব উপলব্ধি হইতেছে। আমরা কায়মনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, আমাদের সাহিত্য-বন্ধু দুর্গাদাস বাবুর এ সাধু-সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হউক, তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া মাতৃভাষার পরিপুষ্টি সাধন করুন। প্রকাশক—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ লাহিড়ী, হাওড়া। এই ঠিকানায় পুস্তক পাওয়া যায়।

জীবন সংগ্রাম। শ্রীযুক্ত রাম পদ বন্দোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১।০ সিকা মাত্র। আমরা ইহার একখানি সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। রাম পদ বাবু সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত, তাঁহার প্রণীত "মানব চিত্র" পাঠে তাহার কৃতীত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য পুস্তকখানি ভাল কাগজে সুন্দর বাঁধাই, ১০০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গবাসীর খাঁটি চরিত্র ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে, লেখা বেশ সুন্দর, চরিত্র চিত্রণে গ্রন্থকার যে বিশেষ পারদর্শী, তাহা কৃষ্ণমোহনের চরিত্র পাঠ করিলে বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়; আজ কাল কৃষ্ণমোহনের ন্যায় স্বধর্ম্ম নিরত সুব্রাহ্মণ হিন্দু সমাজে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—তাই গ্রন্থকার দেশের লোককে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, গ্রন্থকারের লেখনীতে ফুল চন্দন পড়ুক, ভগবান তাঁহার আশা পূর্ণ করুন। বহুদিন আমরা এরূপ সুন্দর উপন্যাস পাঠ করি নাই; এইরূপ ধর্ম্মমূলক উপন্যাস আমাদের দেশে যতই প্রচার হয়, ততই মঙ্গল। আমরা দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে "জীবন সংগ্রাম" পাঠ করিতে অনুরোধ করি, ইহাতে অর্থের সার্থকতা ও সময়ের সদ্ব্যবহার করা হইবে। গ্রন্থকার এই পুস্তকখানির আয় দীন দরিদ্রের সেবার জন্য নিস্বার্থভাবে দান করিয়াছেন। ভগবান তাহাকে দীর্ঘজীবী করুন। কলিকাতা গুরুদাসবাবুর দোকানে এই পুস্তক পাওয়া যায়।

মণিলাল এণ্ড কোম্পানী। আমরা ইহাদের একখানি সুবৃহৎ তালিকা পুস্তক উপহার পাইয়াছি। আগামী মাসে ইহার সমালোচনা হইবে।

আলোচনা, ১১শ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩১৭।

পরমেশ্বরের উপাসনা।

ব্যবহারিক ও পারমার্থিক এ দুই কার্য্য উত্তম রূপে নিষ্পন্ন করা মানুষের প্রয়োজন। শান্ত ও গম্ভীর ভাবে বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করিলেই সিদ্ধিলাভ হয়। বিচারে বস্তু-বোধ, বস্তু বোধে শান্তি ও আলস্যে কার্য্য-হানি জানিবে।

মায়ানদী পার হইতে হইলে পরমাত্মা-মাঝির জ্ঞান-নৌকা চাই। এ পারে ত্রিতাপ, ওপারে মোক্ষ। মোক্ষের দেশে জ্ঞান-নৌকা অনাবশ্যক।

উপাসনায় মন পবিত্র হইয়া জ্ঞান জন্মে। সেই জ্ঞানে জীবাত্মা পরমাত্মার ভেদাভেদ-ভাব অস্ত হইয়া পরমানন্দে স্থিতি হয়।

অনুরাগ বিনা উপাসনায় স্ফূর্ত্তি নাই। পরের প্রতি পরের উপাসনা ভয়ে, লোভে; প্রেমে নহে। যাঁহার উপাসনা তিনি আপনার অপেক্ষাও আপনার।

দ্বৈত-ভাবে প্রেম নাই, অদ্বৈতে প্রেম। জ্ঞানে দ্বৈত অদ্বৈত উভয়ই সমান। দ্বৈত থাকিলেই অদ্বৈতের বিচার, অদ্বৈত থাকিলে দ্বৈতের,—নহিলে নহে। যিনি উপাস্য তিনিই উপাসক, তিনিই উপাসনা, এই ভাবে সানন্দ চিত্তে উপাসনায় পরমানন্দের প্রকাশ জানিবে।

সাকার নিরাকার উভয় লইয়া অখণ্ডাকারেরই উপাসনা। যে নিত্য একই পুরুষ প্রকৃতিকে লইয়া চরাচর জগদ্রূপ, সাকার ও নিরাকারের অতীত, মনোবাণীর অগোচর নিরাকার তাঁহারই উপাসনা, তাঁহারই শক্তি সংযোগে সাধিত হয়। অজ্ঞান বা অযথা দৃষ্টি বশতঃ তাঁহাকে এক বা বহু বলা হয়। যথার্থ পক্ষে তাঁহাতে এক দুই প্রভৃতি সংখ্যা গণনা নাই।

যিনি জগতের মাতা পিতা জ্ঞান-দাতা গুরু, যিনি আত্মা, নিরাকারে তাঁহার রূপ নাই। সাকারে তাঁহার সূক্ষ্মতম রূপ—জ্যোতিঃ। জ্যোতিরূপ লয় হইলে তিনি রূপ বিহীন নিরাকার, সেই জ্যোতিঃস্বরূপের ধ্যান ধারণায় জ্ঞানের আবির্ভাব এবং সেই জ্ঞানই মুক্তি-স্বরূপ পরমানন্দে স্থিতি হয়। অগ্নিতে আহুতি এবং ওঁকার জপ পূর্ব্বক প্রাণায়াম—এই উপাসনার অঙ্গ।

এই উপাসনা কল্পিত নহে, পরমাত্মার বাস্তবিক নিয়মানুগত। যাহার অস্তিত্ব কেবল মনেই আছে বাহিরে নাই, তাহাই কল্পিত। যেমন চিত্রে লিখিত অগ্নি কেবল দর্শকের মনেই অগ্নি রূপে, বাহিরে বস্ত্র ও বর্ণ মাত্র। অতএব ইহা কল্পিত। যাহা বাহিরে অগ্নি ও যাহাকে অগ্নি বলিয়া মনে ধারণা হয়, তাহাই বাস্তবিক ব্যবহারিক অগ্নি।

এই উপাসনায় বাস্তব অগ্নিতে বাস্তব সামগ্রী আহুতি দিতে হয়। অগ্নিব্রহ্ম সেই সামগ্রী বস্তুতই আত্মসাৎ করেন। অগ্নি ভিন্ন অন্য পদার্থে যতই সুখাদ্য দ্রব্য সংযুক্ত কর না কেন, সে নৈবেদ্য বস্তুতঃ কেহই আত্মসাৎ

করে না, কেবল কল্পনাতেই আদান প্রদান হয়।

কোন পুরুষ নিদ্রিত থাকিলে যেমন তাহার সহিত ব্যবহার সম্ভবে না সেইরূপ উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে অজ্ঞান অভক্তির ব্যবধান থাকিলে ব্যবহার চলে না। ব্যবহার স্থাপনের জন্য সেই পুরুষের প্রসিদ্ধ নাম উচ্চারণ ও তাঁহার অঙ্গাদি চালিত করিয়া নিদ্রাভঙ্গ করিতে হয়। অতি পুরাকাল হইতে জ্ঞানী ভক্তগণের মধ্যে প্রণব পরমাত্মার নাম বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই নাম সহযোগে প্রাণায়ামের দ্বারা অন্তর্যামীকে ডাকিলে ব্যবধান দূর এবং জীব ও পরমাত্মার মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা প্রত্যক্ষ হইয়া ব্যবহার স্থাপিত হয়।

জ্যোতিঃ পদার্থ সকলাপেক্ষা সূক্ষ্ম। ইহাতে কেবল প্রকাশ এই গুণ আছে। এই এক গুণ অন্তর্হিত হইলে জ্যোতিঃ নিরাকার। অথচ জগতের যাবতীয় জ্ঞান ও শক্তি জ্যোতিতে প্রতিষ্ঠিত, ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়। জ্যোতির্ভাবে ধারণা না করিলে ব্রহ্ম উপলব্ধি হওয়া দুর্ঘট—ইহাও বাস্তব, কল্পিত নহে।

ব্রহ্মের যে অনির্ব্বচনীয় অখণ্ড ভাব, তাহা স্বয়ং-বস্তু, তৎসম্বন্ধে কল্পনা ঘটিতেই পারে না। এই অকল্পিত বাস্তব উপাসনার চারিটি অঙ্গ কল্পিত হইয়াছে। বিশদ রূপে বুঝিবার জন্য এক একটির বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন।

প্রথম, অগ্নিতে আহুতি। নিরহঙ্কার চিত্তে ভক্তি ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক উত্তম উত্তম পদার্থ ও সুগন্ধি দ্রব্য পরমাত্মার নামে অগ্নি-ব্রহ্মে অর্পণ করিবে। আমাদের কি আছে যে আমরা তাঁহাকে দিব? আমরা এক গাছি তৃণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন করিতে পারি না। তাঁহার দ্রব্য তাঁহাকে দিয়া, তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়া আমরা কৃতার্থ হই। তিনিও তাহাতে প্রসন্ন হন। ইহাতে আমাদের অহঙ্কারের বিষয় কি আছে? অগ্নিতে আহুতি দিলে বায়ু পরিষ্কার হয়। সেই বিশুদ্ধ বায়ুতে দেহ নীরোগ হয় এবং অন্তঃকরণ শুদ্ধ, পবিত্র হইয়া বিবেক জন্মে। যেমন অন্ন জল সংযোগে দেহের বল বৃদ্ধি ও দৈহিক ক্রিয়া সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়, সেইরূপ অগ্নির সঙ্গ করিলে আন্তরিক তেজ বৃদ্ধি হয়। যে সকল উত্তম সামগ্রী অগ্নিতে অর্পিত হয়, তাহার ধূম হইতে মেঘ জন্মে। পরমাত্মা প্রসন্ন হইয়া সেই মেঘ হইতে যথা সময়ে প্রয়োজন মত জল বর্ষণ করেন। তাহাতে প্রচুর পরিমাণে সাত্ত্বিক অন্ন উৎপন্ন হইয়া জীব সমূহকে উপযুক্ত রূপে প্রতিপালন করে। অন্নে সাত্ত্বিক গুণ থাকায় শরীর নীরোগ ও মন পবিত্র হয়। অনাদি কাল হইতে প্রচলিত যজ্ঞাহুতির প্রথা বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, রাক্ষসী বুদ্ধি প্রবল হইয়া জীব সকলকে নানা প্রকারে উৎপীড়িত করিতেছে।

কেহ কেহ বিজ্ঞানাভিমানী বলেন, "আমার শরীরেও ত হাড় মাংসের সহিত অগ্নিব্রহ্ম আছেন। আমি আহার করিলেই অগ্নিতে আহুতি অর্পিত হইল। স্বতন্ত্র যজ্ঞাহুতি প্রদান করা নিষ্প্রয়োজন।" তাঁহাদের প্রতি বক্তব্য এই যে, "তোমরা কেরোসিন তৈল পান করিয়া দেহস্থ অগ্নি দ্বারা অন্ধকার দূর কর; কয়লা, জল উদরস্থ করিয়া রেলগাড়ি টান ও জাহাজ চালাও, তবে ঐ কথা বলিও। আর তোমাদের দেহস্থ পৃথিবীর অংশ হাড় মাংস লাঙ্গলের দ্বারা কর্ষণ করিয়া তাঁহাতে শস্যাদি উৎপন্ন কর।" অন্ন-

মাত্মা যে' আধারে যে গুণ দিয়াছেন তাহার অনুরূপ কার্য্য হইবে? না মনুষ্যের কল্পনা মত হইবে? জ্ঞানীদিগের লক্ষণ এই যে, তিনি বিচার পূর্ব্বক সকল কথার সার ভাব গ্রহণ করেন ও যাহার দ্বারা যে কার্য্য হয় তাহার দ্বারা সেই কার্য্য সমাধা করেন। অগ্নির দ্বারা পিপাসা নিবারণ ও জলের দ্বারা অন্ধকার দূর করিবার চেষ্টা করেন না।

দ্বিতীয়, প্রণব-জপ ও প্রাণায়াম। প্রণব পরমাত্মার নাম। ইহার মধ্যে যে, অকার উকার ও মকার আছে, তাহা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর বলিয়া কল্পিত হয়। এই তিনকে একত্র করিয়া যে একাক্ষর প্রণব তাহাই পরমাত্মার নাম। পরমাত্মাই সৎগুরু বা পরম-গুরু। এ নিমিত্ত "ওঁ সৎগুরু" বলিয়া আন্তরিক ভক্তির সহিত তাঁহাকে মনে মনে ডাকিলে অর্থাৎ "ওঁ সৎগুরু" এই মন্ত্র জিহ্বার দ্বারা উচ্চারণ না করিয়া অন্তরে জপিলে তিনি অন্ত-র্যামী অন্তর হইতে ভাব গ্রহণ করিয়া সাধকের ইচ্ছামিত ফল দেন। যাঁহার কৈলাস বৈকুণ্ঠ প্রভৃতির ভোগের ইচ্ছা তাঁহাকে তদ্রূপ ভোগ দেন। যিনি নিষ্কামী তিনি সকল ফলাফল পরমাত্মাকে অর্পণ করিয়া উপাসনায় নিযুক্ত হন। তিনি কেবল সৎস্বরূপ পরমাত্মাকেই চাহেন বলিয়া পরমাত্মা তাঁহাকে অন্তর হইতে জ্ঞান দিয়া আপনার সহিত অভিন্নভাবে মুক্তি-স্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপে রাখেন। সে সাধক-পুরুষ আর পাপ পুণ্যে লিপ্ত হন না।

জপিবার সংখ্যা বিধি মনুষ্যের কল্পনা। লোকের পুত্র কন্যা বিপদ আপদে মাতা পিতাকে ডাকে এবং মাতা পিতা উত্তর দিলে আর ডাকিবার প্রয়োজন থাকে না। সেইরূপ পরমাত্মার পুত্র কন্যা স্থানীয় জীবগণ সেই পরম মাতা পিতাকে "ওঁ সৎগুরু" বলিয়া ডাকে। তাহাদেরও উত্তর প্রাপ্তির পর আর ডাকিবার প্রয়োজন থাকে না। এক ডাকে উত্তর পাইলে আর ডাকিতে হইবে না। সংখ্যা ডাকে উত্তর না পাইলে আরও ডাকিতে হইবে। নামের কোন ক্ষমতা নাই। যিনি চেতন তাঁহারই ক্ষমতা, তাঁহারই উপর সকল নির্ভর করে। পরমাত্মা মন্ত্রের বাধ্য নহেন, তিনি কোন নিয়মের বাধ্য নহেন, তাঁহার ইচ্ছা মাত্র সকল কার্য্যই সিদ্ধ হয়। তাঁহার অনি-চ্ছায় কোন কার্য্যই হয় না। তিনি দয়াময়, ভক্তি পূর্ব্বক একবার ডাকিলেই দয়া করিয়া ব্যবহারিক ও পরমার্থিক উভয় কার্য্য সিদ্ধ করিয়া দিতে পারেন। তাঁহার দয়া না হইলে লক্ষ লক্ষ জপও নিষ্ফল।

প্রাণায়ামের দ্বারা দেহস্থ চঞ্চল বায়ু সূক্ষ্ম হইয়া স্থির হয়। বায়ু যতই সূক্ষ্ম হয়, ততই জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতার প্রতি নিষ্ঠা, ভক্তি প্রেম বৃদ্ধি হয় এবং অন্তরে জ্ঞান ও আনন্দ উদিত হয়। ক্রমে জ্ঞানের পরিপাক দ্বারা সাধক পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকেন। তখন আর জপ বা প্রাণায়ামের প্রয়োজন থাকে না। ভক্তিপূর্ব্বক "ওঁ সৎগুরু" মন্ত্রের জপ করিলে বা পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের উপাসনা করিলে, স্বতন্ত্র প্রাণায়াম না করিলেও প্রাণা-য়ামের কার্য্য হইয়া যায়।

তৃতীয়, জ্যোতিঃ-স্বরূপের ধ্যান ধারণা। চন্দ্রমা সূর্য্য নারায়ণ, জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষ অনাদি বর্ত্তমান। ইহাকে ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম ও ধ্যান, ধারণা, উপাসনা করিলে উভয় কার্য্য সিদ্ধ হয়। এ নিমিত্ত অতি পুরাকাল

হইতে ঋষি মুনি প্রভৃতি জ্ঞানী ভক্তগণ, সূর্য্যনারায়ণ, বিরাট জ্যোতিঃ, গুরু, মাতা পিতা, আত্মার উপাসনার দ্বারা পরমপদ পাইয়া আসিতেছেন। ইঁহার শরণাগত হও ইনি সকল বিপদ মোচন করিবেন, ইঁহা হইতে বিমুখ হইয়া জীবগণ নানা কষ্ট ভোগ করিতেছে। প্রত্যক্ষ দেখ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নানা স্থূল পদার্থ কখনই নিরাকার হইতে পারিবে না, যেমন তেমনই থাকিয়া যাইবে। কিন্তু সকল পদার্থই অগ্নিব্রহ্ম আত্মরূপও পরে নিরাকার করিয়া দেন। সেইরূপ তোমাদের অন্তঃকরণস্থ অজ্ঞান, আশা তৃষ্ণা, লোভ লালসা, কাম ক্রোধ, মোহ ভয়, যদ্দ্বারা তোমরা সর্ব্বদা পীড়িত হইতেছ, তেজোময় জ্যোতির সংযোগ বিনা কখনই তাহার নির্ব্বাণ হইবে না। জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মার শরণাগত হইলে তিনি জ্ঞানাগ্নির দ্বারা ইহাদিগকে ভস্মীভূত করিয়া জীবাত্মা পরমাত্মাকে অভেদে প্রত্যক্ষ করাইয়া সাধককে মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন। ইহা সত্য বলিয়া জানিবে।

চতুর্থ, পূর্ণ অখণ্ডভাব। বেদ প্রমুখ সর্ব্ব শাস্ত্রের মূল ব্রহ্মগায়ত্রী। ব্রহ্মগায়ত্রীর মূল ওঁকার। ওঁকারের মূল নিরাকার সাকার পূর্ণ পরব্রহ্ম বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ। গায়ত্রী জপিলে সমস্ত ক্রিয়ার ফল লাভ হয়। গায়ত্রী না জপিয়া ওঁকার জপিলে সেই ফলই লাভ হয়। ওঁকার পর্য্যন্ত ছাড়িয়া চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপের সম্মুখে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক পূর্ণ ভাবে নমস্কার করিলে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কার্য্যই সিদ্ধ হয়। নানা মিথ্যা প্রবঞ্চনার কোন প্রয়োজন থাকে না—ইহা ধ্রুব সত্য।

ইন্দ্রিয়াদির সহিত আপনাকে লইয়া নিরাকার, সাকার, অখণ্ডাকার পূর্ণরূপে পরমাত্মাকে নমস্কার করিতে হয়। আপনাকে ছাড়িয়া পূর্ণরূপ হয় না। নিরাকার সাকার, কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচর, স্ত্রীপুরুষ লইয়া তিনি পূর্ণ। কোন একটীকে ছাড়িলে পূর্ণভাবের হানি হয়। তুমি তাবৎ স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদিকে লইয়া পূর্ণ ও গুণাতীত। কোন একটী অঙ্গ বা শক্তি ছাড়িয়া দিলে তোমার অঙ্গহানি হয়। স্থূল শরীর সম্বন্ধে যেমন তুমি, তোমাকে লইয়া সংসার-বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধেও তেমনই তিনি।

ইঁহারই সম্বন্ধে দ্বৈত অদ্বৈত ভাব। যতক্ষণ অজ্ঞান ততক্ষণ দ্বৈত, জ্ঞানে অদ্বৈত ও স্বরূপে যাহা তাহাই। এইরূপ সকল ভাব বুঝিয়া স্ত্রী পুরুষ, গৃহস্থ সন্ন্যাসী প্রভৃতি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডবাসী পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, গুরু, মাতা, পিতা আত্মার উপাসনার দ্বারা ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় বিষয়ে কৃতার্থতা লাভ করিবে।

সর্ব্বশেষ কথা।—মনুষ্যগণ, আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া শান্তচিত্তে বিশ্বাসপূর্ব্বক এই কথাগুলি ধারণ কর। নিশ্চিত জানিও যে ইহাতেই জীবের ব্যবহারিক ও পরমার্থিক মঙ্গল।

১। সর্ব্বপ্রকারে ব্রহ্মাণ্ড পরিষ্কার রাখ ও জীব মাত্রের অভাব মোচনে যত্নশীল হও।

২। অগ্নিতে ভক্তিপূর্ব্বক সুস্বাদু সুগন্ধ পদার্থের আহুতি দাও ও দেওয়াও।

৩। ওঁকার মন্ত্র বা নাম জপ করিয়া পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে ডাক।

৪। জ্যোতিকে নেত্রে ও মস্তকে ভক্তিভাবে ধারণ কর।

যিনি পূর্ণ তাঁহাতে নিষ্ঠাবান হও।

ইনি জগতের গুরু মাতা পিতা আত্মা। ইনি প্রসন্ন হইয়া সর্ব্ব অমঙ্গল দূর করিয়া সর্ব্ব-বিষয়ে আমাদের মঙ্গল করিবেন। ইঁহার অতিরিক্ত আড়ম্বর কেবল কষ্টের হেতু হইবে। ইহা ধ্রুব সত্য।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরমহংস—শ্রীমৎ শিবনারায়ণ স্বামী।

ভবারণ্য।

চল মন! চল নিজ নিকেতনে;
এ ভব-অরণ্যে দস্যুর ভয়।
সাবধান যেন না হরে জীবনে,
—দস্যুরা গোপনে লুকায়ে রয়॥
'সত্তরজোতমঃ' দস্যু তিন দল,
জ্বালায় পথিকে করি' ছল বল,
লুটে' লয় তারা পাথেয় সকল।
শুধু 'তম'-হাতে পড়িলে জানিও
নিশ্চয় অকালে মরিতে হয়।
—'তমঃ' একা পেলে না বধি না ছাড়ে;
(তাও) পাষাণ-হৃদয় খলতাময়॥
'সত্ত্ব' 'রজঃ' মন! দস্যুদের মাঝে,
কেহ ত এমন নিঠুর নয়।
পড়িলে পথিক তাহাদের হাতে,
প্রাণটি লইয়া ভবারণ্য হ'তে
সহজে যাইতে সমর্থ হয়॥
'সত্ত্বের' মতন দয়ালু এমন
তিনের মাঝারে কেহই নয়।
মুখেতে রজঃ উঠাইলে তমঃ
আর এক 'রজঃ' তাহারে কয়,
কি কাজ মারিয়া, হাত পা বাঁধিয়া,
ফেলে' রাখ তারে, পাথেয় হরিয়া;
'তমঃ' সে বচন মানিয়া লয়।
'রজোতমঃ' মন! গেলে চ'লে দূর
'সত্ত্ব' এসে' চুপে,—কৃপার্দ্র সুর,
বাঁধন খুলিয়া ঘুচায় ভয়॥
আহার যোগায়ে 'সত্ত্ব' নিজ হ'তে,
সঙ্গে লয়ে চলে এ ভীম পথে;
আবাস সকাশে আসিয়ে কয়,
"দেখা যায় ওই দেখ্ তোর বাড়ী;
জ্বলিছে উজল আলোক তায়।"
আলোর রেখাটী ধরিয়া পথিক
গৃহপানে সুখে নাচিয়ে যায়॥
শুন বলি মন! পড়ি' দস্যু হাতে,
ডাকিও উচ্চে করুণাময়,
ত্রাহি ত্রাহি বলো এ ভব-বনেতে
'সত্ত্ব' যাবত আগত নয়॥ *

শ্রীজগবন্ধু চৌধুরী।

পৌষে কুহু।

(১)

আমার দুঃখ দৈন্যময় জীবনের ক্ষণিক অবসরে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছি—কেন ভাবিতেছি জানি না। তখন আমার হৃদয়ের

---

* সত্ত্বরজোতমঃ ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মকে লাভ করিতে ত্রিগুণাতীত হইতে হয়। 'সত্ত্ব' মোক্ষধামের পথ-প্রদর্শক মাত্র,—সত্ত্বের বিচরণ স্থান মোক্ষধাম হইতে অনেক দূর। জীবকে সঙ্গে লইয়া মোক্ষধামের নিকটবর্ত্তী হইলেই সত্ত্ব জীবকে পথ দেখাইয়া পলায়ন করে।

"গুণত্রয় ব্যতিরিক্তং সচ্চিদানন্দ স্বরূপঃ।"
অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ স্বরূপব্রহ্ম ত্রিগুণাতীত।

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ।

মধ্যে অতি ক্ষীণ আশার-ছায়াপাত হইতেছিল ; কি-যেন-কি অলক্ষিতে আমার দুঃখ সন্তপ্ত হৃদয়ের রুদ্ধ-দ্বার ধীরে ধীরে খুলিতেছিল ; কে যেন অতি যত্নের সহিত আমার হৃদয়ের অনন্ত বিষাদের যবনিকাখানি অপসারিত করিতেছিল ; অতীত জীবনের দুঃখময় নিশীথিকার ঘন-অন্ধকার-সংশ্লিষ্ট অনন্ত বিষাদ, ঘৃণা, অবসাদ বুকে ধরিয়া এ ক্ষুদ্র জীবনখানি আজ যেন সুখময় সৌন্দর্য্যের মধ্যে অতি সহজেই হাবুডুবু খাইতেছে ; আজ যেন শূন্য প্রাণখানি কি এক অসংবৃত পূর্ণতায় ভরিয়া গিয়াছে। আজ যেন আমি নব প্রতিষ্ঠিত অভিনব রহস্যময় কাল্পনিক জগতের প্রমোদ উদ্যানের ফুল-বেদিকার বিচিত্র আস্তরণের উপর হেলিয়া বসিয়া কত কি ভাবিতেছি, আজ যেন আমার চির অভিপ্সিত কামনার ধনের ধ্যান লক্ষ করিয়া আমি ধ্যানাসুরক্ত ও অবিচলিত। মনে হয় যেন—জগতের তত্ত্বৎ অরূপ-সৌন্দর্য্যের মধ্যে আমার সব কিছু মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে। আমি সত্যই বলিতেছি, তখন না জানি, কেন, কোন্ কুহক-বলে আমি সংজ্ঞাহীন ছিলাম।

(২)

অদূরে সীমাবর্ত্ত প্রান্তরোস্থিত সহকার-তরুর আগডালের পত্র-কুঞ্জাভ্যন্তর হইতে বসন্ত পারিষদ কোকিল পাখী গাহিয়া উঠিল—কুহু! অকস্মাৎ মুহুর্ত্তের মধ্যে আমার ক্ষীণ আশান্দলিত প্রাণখানি মুহুর্মুহু শিহরিয়া উঠিল। কি এক অব্যক্ত মদিরাময় উচ্ছ্বাসে আমার হৃদয় প্লাবিত হইয়া গেল।

না জানি—অসময়ে পাখী কি গাহিল—কুহু! আ-মরি মরি! কি হর্ষোৎফুল্ল কুহুরব! আহা! কি মন ভুলান, প্রাণ মাতান সুমধুর তান—কুহু? প্রভাতী আরতির উচ্ছলিত ভৈরবী কোলাহল ভেদ করিয়া ঐ যে শুনা গেল—কুহু! আঃ! কি সুধাময় স্বরের রেশ! তাহার কি মাদকতা শক্তি! কাণে পশিবামাত্র প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। নব-বসন্তের বনবাঁশী শুনিয়াছি, সাগর-সম্মিলিতা প্রবাহিনীর উচ্ছ্বসিত কুলুকুলু নাদ শুনিয়াছি, গম্ভীর নিশীথে বিরহিনীর হৃদয়-বিদারক করুণ গান শুনিয়াছি, কোনটিই কুহুরবের উপমা হয় না ; যেন বিশ্বময় সে সুমধুর কুহুরবে পরিপূর্ণ। বুঝি তজ্জন্যই উদ্‌ভ্রান্ত কবি আকুল প্রাণে গাহিয়াছেন—

"কুহুতানে আকুল করে প্রাণ"

(৩)

আমার হৃদয়ের অন্তস্তল প্রদেশ হইতে মর্ম্ম মথিয়া হৃদয়-তন্ত্রিতে বাজিয়া উঠিল—কুহু! পুণ্যগাথা প্রাচীন ইতিবৃত্ত পাঠে জানিতে পারিয়াছি শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর রবে ধেনু-বৎস ফিরিত ; যমুনা উজান বহিত, ব্রজ-কুলবধূ কুলত্যাগিনী হইত ; হায়! এই মধুময় কুহুরব শুনিয়া যেন তাহা উপকথা বলিয়া ভ্রম হয়। এজন্য বুঝি কবি আবার গাহিয়াছেন—

'কুঞ্জে কোয়েলা কুহুতানে,
মন বাঁধি কেমনে, প্রাণ বাঁধি কেমনে।"

ধীরে ধীরে আমার চির-আকাঙ্ক্ষিত আয়োজন সব বৃথা হইল। না জানি—কি দারুণ বেদনায় আমার হৃদয়স্থিত সুখ-শান্তি কোথায় কোন অসীমতায় মিশিয়া গেল। আমার হৃদয়-কুঞ্জের আশালতা সমূলে উৎপাটিত হইল। আমার হৃদয়ের মধ্যে যে ক্ষীণ আশা-দীপিকা মিট্ মিট্ জ্বলিতেছিল, তাহা ক্ষণেকের মধ্যে নির্ব্বাপিত হইল। চোখের পলক পড়িতে না, পড়িতেই আমার সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

জ্যোৎস্না বিধৌত শান্ত-সিন্ধু-বক্ষ সদৃশ এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে দেখিতে দেখিতে বিষাদের লহর উদ্বেলিত হইয়া নাচিতে লাগিল—খেলিতে লাগিল।

(৪)

তৎ সঙ্গে সঙ্গে আমার সুখময় কৈশোর জীবনের স্বপ্নময় অতীত কাহিনী এক একটি করিয়া স্মৃতি-পথে আসিতে যাইতে লাগিল। পিকবর! কেন তুমি অসময়ে তান ধরিলে? তুমি কেন আমার সুখ শান্তি নষ্ট করিয়া দিলে? হায়! তুমি অতি হৃদয়হীন—নিষ্ঠুর! লোকের সময়াসময় বুঝনা কেন? ক্ষান্ত হও, আর ঐ মধুময় কুহুরব করিও না। তোমার ঐ কুহুতানে আমার হৃদয়ে বিষম-ব্যথা আনিতেছে। পিকবর! আবার যে গাহিলে—কুহু! কথা শুনিলে না? আমার হৃদয়ের ব্যথা বুঝিলে না? গাও তবে—গাও।

তুমি যেমন আজ মনের আনন্দে প্রাণ খুলিয়া গাহিতেছ, আমারো এমন একদিন ছিল তোমার মতন প্রাণ খুলিয়া মনের কথা গাহিতাম; আমার সেদিন ফুরায়ে গিয়াছে—জন্মের তরে ফুরায়ে গিয়াছে। পিকবর! আমার সুখময়ী রজনীর অবসান হইয়াছে, তুমিও সময় বুঝিয়া আমার প্রাণের আকুলিত প্রার্থনা পূর্ণ করিবে না।

(৫)

যখন ধীরে ধীরে এই ক্ষীণ হৃদয়ে দুঃখের সুরু জ্বলিতে আরম্ভ হইয়াছে—জ্বলিতেই থাকুক। তোমায় আর বাধা দিব না—তোমার সুখের পথে কাঁটা দিব না। তুমি গাহিয়া গাহিয়া সুখী হও, বেশ, গাও—গাও, প্রাণ খুলিয়া মনের কথা গাও। তোমাকে বিশেষ তেমন কিছু আর বলিবার নাই। কিন্তু পিকবর! তোমার ঐ সুস্বর সম্মিলিত আমার হৃদয়ে নিদারুণ বজ্রসম বিঁধিয়াছে। তোমার সুখময় বাঁশীর সঙ্গে সঙ্গে আমার দুঃখের বাঁশী বাজিয়া উঠিল; হা অদৃষ্ট! দোষ আর কার দিব এ সংসারে সুখদুঃখ অখণ্ডনীয় ও অবশ্যম্ভাবী।

মধুময় কিশোর জীবনে যাহা গত হইয়া গিয়াছে তাহা প্রাণ বিনিময়েও ফিরিয়া পাইবার নয়। হায়! কখনও ভাবি নাই যে—সময়ের স্রোতে সকলই চিরদিনের মত বিলয় হইয়া যাইবে। এই জীবনে নানা দুর্বিসহ যাতনা-ভার বুকে ধরিয়া এক রকম শান্তিতে ছিলাম। আজ তোমার আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে আমার দুঃখের আগুন ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

(৬)

তার সেই সঙ্গে সঙ্গে মধুর গাম্ভীর্য্য, সুখশান্তি তিল তিল করিয়া স্তূপাকারে সে আগুনে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইতেছে। সমগ্র প্রাণ দিয়া আমি যার ধ্যানানুরক্ত ছিলাম, এই নগ্ন হৃদয়ের যাহা উপাচার রূপে সঞ্চিত ছিল, এই ক্ষুদ্র পীড়িত জীবনে অদৃষ্ট জনিত প্রাণান্তক অভিশাপ—যাহা অবনত মস্তকে ধারণ করিয়া, যে আকুল আকাঙ্ক্ষায় পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্য্যের মধ্যে জাগরিত ছিলাম, পিকবর! তাহা ধরাময় উচ্ছসিত তোমার প্রেম সঙ্গীতের লহরে লহরে চিরদিনের মত কোথায় কোন্ অসীমতায় অপসারিত হইয়া গেল। হায়! আজ কি কুক্ষণে গাত্রোত্থান করিয়াছিলাম।

আজিকার মনোময় আকাঙ্ক্ষিত মহা-মিলনের মাহেন্দ্রক্ষণে, আজিকার সুখময় সুপ্রভাতের মঙ্গলময় শুভক্ষণে, বিগত রজনীর স্বপ্নোত্থিত আরামের সময় যে বিপুল আয়ো-

জনে বরণডালা সাজাইয়া, যাহাকে হৃদয়মন্দিরে কল্পনার পুষ্পময় সৈকতাসনে দেবতাজ্ঞানে অধিরূঢ় করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলাম—তাহা আর পারিলাম কই?

(৭)

বিহগবর! তুমি অসময়ে কি তান ধরিলে—কি গান গাহিলে—কুহু! উঃ! সব যে আমার পণ্ড হইয়া গেল। প্রভাতী আরতির সুরের মাঝে তোমার ঐ সুধাময় সুরের রেস্ এমন ভাবে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে যে—আমার ক্ষুদ্র প্রাণে এমন শক্তি নাই, আমার বোধ হইতেছে—আমার হৃদয়ের অন্তস্তম প্রদেশের অকর্ম্মণ্য তন্ত্রি-তাঁর, কে যেন কি-এক অব্যক্ত রেজনের ধারায় ঘসিয়া মাজিয়া সংস্কার করিয়া দিতেছে। ইহা আমার সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য কিছুই বুঝিতেছি না। ইহা আমার সুখের না দুঃখের তাহা উপলব্ধি শূন্য। পিকবর? ধন্য তোমার সুধাময় সঙ্গীত শক্তি!

(৮)

তোমার মোহন কণ্ঠের সুললিত তান আমার কাণে শ্রুতিশ্রাব্য লাগিতেছে কেন? তোমার ভুবন-ভুলান মোহনরূপ আমার চক্ষে বিচিত্র ভাব দেখাইতেছে কেন? জৈব-জগতের হৃদয়গ্রাহী ব্যক্তিমাত্রেই যে তোমার প্রিয় ভক্ত ও সাধক। সকলেই যে তোমার স্নেহাকাঙ্ক্ষী? তুমি গুণে বড় হইয়াছ—পরোপকারে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছ, তোমায় মানিবে না কে? এ জগতে রূপে বড় হওয়া যায় না। তোমার স্বরে বিভিন্ন বিভিন্ন সাধকগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিভোর হইয়া প্রাণে অপার আনন্দ লাভ করিতে পারে। তুমি সকল সময় গান গাহ না, তাই নীরব-পৌষে তোমার স্বর যে শুনিয়াছে সেই বুঝিয়াছে-পাখি! পরোপকারেই তুমি সুকণ্ঠ, রূপ না থাকিলেও তোমার পূজা করা উচিত। কেননা গুণের আদর—রূপের নহে।

শ্রীরাজচন্দ্র চৌধুরী।

আবাহন।

(১)

তটিনী প্রান্তরে শৈল শিখরে,—
বসে আছি একা আমি
ওই দেখা যায় অদূরে আমার
জননী জনম ভূমি!

(২)

প্রকৃতির আহা কি মধুর ছবি
আমার স্বদেশ ভূমি!
সান্ধ্য অনিল আসে ধীরে ধীরে
যেন বা তাহায় চুমি।

(৩)

দেখা যায় যেন অদূরে পশ্চাতে,
আমার হৃদয় স্বামী
দাঁড়ায়ে রয়েছে সাথে লয়ে যেন
আমার জনম ভূমি!

(৪)

আহা মরি মরি কি দৃশ্য মধুর!
ভাসিছে তারকা রাজি
উপর গগণে জড়িয়ে তটিনী
নাচিছে যেন বা সাজি।

(৫)

মনে হয় যেন পাখা প্রসারিয়া
মিশি গো তাদেরি সনে,
হৃদয় আবেগ প্রেম ভালবাসা,
বলিগো তাদেরি কাণে!

(৬)

হায় মা! জননী রয়েছে চাহিয়ে
সজল নয়নে দুখে;
মিশে যাই পাছে অনন্তের মাঝে
অসীম দিগন্ত বুকে!

(৭)

না, না, ওমা আজি তোমারে ছাড়িয়া
কোথাও যাইব না গো!
আমি যে তোমার রক্ত মাংস ওমা
তুমি যে জননী মাগো!

(৮)

জননী আমার শ্যামল কায়,
জননী আমার ধরা?
কত ধান্য ক্ষেত, কত তৃণ লতা,
বিবিধ শোভনে ভরা।

(৯)

কত বৃক্ষ লতা দুলিতেছে তোর
আলোল বাতাস ভরে,
যেন ওমা তুমি ডাকিতেছ মোরে
বাড়ায়ে অকল করে!

(১০)

স্বর্ণ-কণ্ঠ রবে বাতাসের সুর
বিপুল ঝঙ্কার করে।
যেন প্রতিপলে কথা গুলি তোর
আসিছে বায়ুতে উড়ে!

(১১)

ধন্য মাতৃ স্নেহ! সন্তান বৎসলা
জননী আপনা হারা!
এসগো মুছাই, সযতনে তোর;
অঞ্চলে নয়ন ধারা!

শ্রীনলিনীকান্ত দাস।

শ্রমজীবীর জীবন সমস্যা।

বর্ত্তমান কম্মযুগে ব্রাহ্মণও শ্রমজীবীর শ্রেণীতে ভুক্ত হইয়াছেন। শ্রমজীবী শব্দের অর্থে যাহারা শারীরিক শ্রম দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করে। ব্রাহ্মণ পুরাতন সমাজে মানসিক শ্রম দ্বারা জীবিকার সংস্থান করিতেন। ব্রাহ্মণের সেই বৃত্তি এখন লোপ হইয়াছে। শ্রমজীবি বলিলে বর্ত্তমান কম্মযুগে ব্রাহ্মণকেও বুঝিতে হইবে।

আজ দেশের এতাদৃশী দুরবস্থা হইয়াছে যে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ পরিবার অতি নীচ জাতীয়ের ন্যায় শারীরিক শ্রম ব্যতিরেকে আর জীবিকার সংস্থান করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। যাঁহারা একদিন সমাজের শীর্ষস্থানে থাকিয়া ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ বিধান করিয়া আসিতে-ছিলেন, সেই যোগভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ সন্তানগণ আজ নিরন্ন এবং অতি হীনজনোচিত কার্য্যে ব্যাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন? সমাজের মস্তক, বাহু, উরু, পদ, সবই শিথিল হইয়া জড়স্থবির বৃদ্ধের ন্যায় একত্রে পুঞ্জীভূত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-পদ আজ পর পদাঙ্কানুসরণে এবং ব্রাহ্মণ হস্ত আজ পরপদ সেবায় তৎপর হইয়াছে।

ব্রাহ্মণেতর জাতিরও এতাদৃশী অবস্থা। হীনবৃত্তির দ্বারা জীবিকার সংস্থান করিতে গেলে

চিত্তে যে সকল পাপ প্রবৃত্তির প্রাদুর্ভাব হইতে পারে, তাহাও যথেষ্ট পরিমাণে পরিস্ফুট হইয়াছে। সমাজ রক্ষা আর ইহাদিগের দ্বারা সম্ভবপর নহে। দেশ, জাতি, ধর্ম্ম, সমাজ সম্বন্ধে ইহারা কিছুই বুঝিতে পারে না।

ব্রাহ্মণাদি জাতি মিলিয়া একত্রে একগ্রামে একটী সমাজ স্থাপিত করিয়া সৌহার্দ্দে চিরকাল বাস করিত। এখনও তাহার রাশি রাশি ধ্বংশাবশেষ ভারতভূমি বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন। সেই ধ্বংসাবশিষ্ট পুরাতন গৃহে ভূতপ্রেত,পিশাচ, পেচকের বাসস্থান হইয়াছে। একগ্রামে ব্রাহ্মণ কায়স্থ, বৈদ্য, শূদ্র, কৃষক শিল্পি প্রভৃতি বাস করিতেছে। তাহার মধ্যে কেহবা গ্রামের ভূম্যাধিকারী, কেহবা মহাজন টাকাধার দেওয়া ব্যবসা। কাহারও সহিত কাহারও সৌহার্দ্দ নাই। পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিয়া নিজে বড় হইতে সতত চেষ্টা করে। যদি তাহা প্রকৃত পক্ষে না পারে, তাহা হইলে মনে মনে কেহ কাহার মঙ্গল কামনা কখনও করে না। বরং অমঙ্গলই সদা চিন্তা করিয়া থাকে। কেহ কাহারও সাহায্য বিনা স্বার্থে করিতে প্রস্তুত নয়। কেহ কেহ কাহারও শ্রী দর্শনে সন্তুষ্ট নহে। একজন অসৎ সঙ্গে পতিত হইয়া নষ্ট হইতে চলিল। সমাজস্থ অপরাপর ব্যাক্তিগণ দূরে দাঁড়াইয়া তাহার পতন দেখিয়া হর্ষিত হইতে লাগিল। কেহ কাহাকেও ধরিয়া তুলিবে না। স্বপ্নেও কেহ কাহারও মঙ্গল কামনা করিবে না। এতাদৃশ স্বভাব সম্পন্ন যে জনসংহতি তাহাকে সমাজ বলা যায় না। এবং সেই জনসমাজ বেশীদিন সুস্থ ও সবল থাকিতে পারে না। সেই সমাজের ধ্বংস অচিরাৎ ঘটিত হয়। গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণ নীচ হইয়া যাইতেছে। শ্রমজীবি কৃষক ও শিল্পিকুল উৎসন্ন যাইতেছে। কে কাহাকে রক্ষা করিবে? ক্ষুধার্ত্ত জননিবহ অন্নের সন্ধানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে। কাজেই ইহারা একত্রে চেষ্টা করিয়া অন্নসংস্থানে আত্মরক্ষা কিরূপে করিতে হয়, তাহা জানে না। এবং কেহ কাহাকে শিক্ষা দিতেও পারে না।

যখন সমাজ এইরূপ দুরবস্থ হইয়া পড়ে, সাথে সাথে ভগবানের কৃপা - কটাক্ষও আসিয়া উহার উপর পতিত হয়। মনুষ্য যখন অজ্ঞানতা নিবন্ধন ধ্বংশের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, জ্ঞানের আলোক হস্তে করিয়া ভগবান তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসেন। এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত সমাজকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি কি ব্যাকুল হন নাই? লোক রক্ষার নিমিত্ত কি দেবতার সিংহাসন কাঁপিয়া উঠে নাই? ব্রাহ্মণের হৃদয় কি উদ্বেলিত হয় নাই?

দেশে ধর্ম্মের স্রোত ফিরিয়াছে। এক্ষণে দেশের যাহারা ধনকুবের, যাহাদের উপর দেশের আশা ভরসা সমস্ত নির্ভর করিতেছে, তাহাদিগকে বলি—হে সহস্রাধিপ, লক্ষাধিপ, ধনকুবেরগণ তোমারা আর কতকাল তোরণ দ্বারের অর্গল রুদ্ধ করিয়া ভরপুর বিলাস সুখ ভোগ করিবে, দেখিতে পাইতেছ না, তোমার আশেপাশে সহস্র সহস্র সতীর্থ প্রাতিবেশী অনাহারে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছে। তোমার সুরম্য হর্ম্ম্য তাহাদিগের জীর্ণ শীর্ণ কুটীর গুলিকে ভূমিসাৎ করিয়া সদর্পে অভ্র ভেদ করিয়া উঠিতেছে। তুমি বিলাসের লালসায় মুগ্ধ হইয়া আছ; তোমার [illegible]

যিনি তিনি তুষ্ট হইয়াও তাঁহার উত্তাপ বোধ করিতে পারিতেছি না। ভাই! বড় হইয়া এরূপ ভাবে থাকা চলে না, বড় হইয়া ছোটকে দেখিতে না পারিলে তাহার বড় হওয়া বৃথা। যাহার জোরে তুমি বড় -তাহাকে না দেখিলে— তোমার বড়ত্ব কোথায় ? ছোট না থাকিলে ত তুমি বড় হইতে পারিতে না, তবে তাহাকে ক্রোড়ে স্থান দাওনা কেন ? ভাই ! ছোটকে রক্ষা করাই মহাধর্ম্ম, এক্ষণে সকল প্রকারে ধর্ম্মের উদ্দীপনা করিতে না পারিলে আর শ্রেয় নাই। আজ ধর্ম্মের অভাবে অনেক অকরণীয় কার্য্যও হিন্দুর দ্বারা সংসাধিত হইতেছে। সমাজে অনাচার প্রবেশ করিলেই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া জাতি নষ্ট হয়। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে ধনী ও ব্রাহ্মণের আবশ্যক। ব্রাহ্মণগণকে স্বকার্য্যে নিয়োজিত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় দেশে ধর্ম্ম শিক্ষার প্রচলন করিতে পারিলে তবেই এ উচ্ছৃঙ্খলতা ঐ অনাচার নিবারিত হইবে, দেশে ধর্ম্মের জ্যোতি প্রতিফলিত হইবে, দেশে শান্তি আসিবে, তোমরা সহায় না হইলে দেশে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি হইবে না, ব্রাহ্মণ-গঠন করিয়া সমাজ ও ধর্ম্মের উন্নতিও হইবে না।

কাহিনী।

জননী জনম ভূমি হে মোর স্বদেশ।
পূরবে চাহিয়া দেখ বীর বৃকোদর
স্তুত সম, পর্ব্বত মহান্ রহিয়াছে
নিরাপদে রক্ষকের মত শত্রুদের
প্রতীবন আক্রমণ হ'তে, মা তোর
হৃদয়-মণি দিবস যামিনী, উত্তরে
দাঁড়ায়ে দেখ দুই প্রান্তে দুটী স্রোত
পর্ব্বতের বুক হ'তে চুমিয়া চরণ
বহিতেছে দীর্ঘ কণ্ঠে পূরাইতে তৃষ্ণা
তোর। শোন ওই নির্ঝরের গান, পশ্চিমে।
বিস্তৃত দেখ কত শ্বেত দ্বীপ রচিয়া
বিবিধ চকে, প্রক্ষালিয়া শত পল্লী,
তোর পুত ধারা ওই নির্ঝরের জলে
মিশিছে নীলাম্বু স্রোতে কর্ণফুলী প্রায়।
অনন্ত এ মাতৃরাজ্যে মোর ক্ষুদ্র এই
পল্লীগ্রাম, প্রাসাদ শোভিত বহুজন
যেইখানে করেন বসতি, সে সবার
মাঝে দত্তজ-বংশের মহা সুপণ্ডিত
ছিল একজন। হের ওই প্রশান্ত—
মূরতি প্রকৃতির মহা কবি আকাশের
পটে ; যাহার ঘুমন্ত এই জোছনার
ছায়া রাখিয়াছে মাতৃভূমি আলোকিত,
জাগরিত, নীরব, নিস্তব্ধ যথা পূর্ণিমা
নিশীথে। যাহার রজত স্নাত কবিতা
কিরণে বিদূরিত অন্ধকার, আলোকিত
অনন্ত এ বিশ্বরাজ্য হ'তে ক্ষুদ্র এই
পল্লীভূমি। যাহার সৌন্দর্য্য পূর্ণ ভাবের
আবেগ ছাইয়াছে বিশ্বময় জলে
কিবা স্থলে, মিশিয়া মিশিয়া দেখ
সফেন জড়িত কোথাও বা সিন্ধুসনে
চলেছে গাহিয়া, কোথাও বা শৈল সাথে
করিছে বিহার, বনস্পতি মূলে, কভু
কুরঙ্গের সনে। প্রকৃতির অলঙ্কার
যা আছে ভুবনে, আমি মনে করি
সব কিছু আছে মোর এই ক্ষুদ্র গ্রামে।
অতীত বিক্রম, যশ, গৌরব কাহিনী
চিরপরিচিত যাহা ভারত সমাজে।
অক্ষয় বলিয়া যার কীর্ত্তিস্তম্ভ চির—
বিরাজিত এই মহা বঙ্গের মন্দিরে,
এখনো জাগ্রত তিনি সুসভ্য জগতে ;

সেই আমাদের জগবন্ধু। এইরূপ
আরো কত শত যাদের আশ্রয় ধরি
চলিছে জগত ; চলিছে স্বদেশ মোর
উন্নতির পথে। ধীরে ধীরে তৃণ গুলি
উঠেছে ফুটিয়া ; আসিয়াছে অতীতের
বসন্ত বাতাস প্রকৃতির উপবনে
স্বদেশে আমার ; এই মোর পূণ্যভূমি।
প্রাণ প্রিয় স্বগ্রামের অপূর্ব কাহিনী। *

শ্রীনলিনীকান্ত দাস।

ভিখারী।

(মোপাঁসার ফরাসী গল্প অবলম্বনে।)

তিন দিন ধরিয়া অবিরাম জল পড়িতেছিল—কালো মেঘে সমস্ত আকাশ সম্পূর্ণরূপে আবৃত—সূর্য্য চন্দ্রের দর্শন দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল। ছোট গ্রাম খানি জলে পরিপূর্ণ হইয়া যেন অসীম সমুদ্রের শোভা ধারণ করিয়াছিল—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কুটীর গুলি দূর হইতে যেন দ্বীপাবলীর ন্যায় সেই সমুদ্রের বক্ষে দেখাইতেছিল।

ভিখারী দুঃখীরাম তাহার ভগ্ন-কুটীরের দাওয়ায় বসিয়াছিল—তিন দিন ভিক্ষায় বাহির হইতে পারে নাই। খোঁড়া ক্ষুধায় অস্থির হইয়াছিল—কিন্তু উপায় নাই—এরকম অন্ধকার—এরকম বৃষ্টি—ভেদ করিয়া একজন খোঁড়া ভিখারীর পক্ষে সহরে যাওয়া অসম্ভব। আর যাইলেই বা ভিক্ষা দেয় কে ? তাই নিরাশায় অবসন্ন, ক্ষুধায় উৎপীড়িত হইয়া হতভাগ্য নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিল। অনেক অতীতের কথা মনে পড়িতেছিল—আর সেই সঙ্গে ফোঁটার পর ফোঁটা চখের জল তাহার সেই রুক্ষ-শুষ্ক-গণ্ডস্থল দুটী সিক্ত করিতেছিল—দুঃখ আসিয়া অজ্ঞাতে যখন অশ্রুদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয় তখন সে অশ্রুবেগ রোধ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

চিরকালই দুঃখীরামের দুঃখে কাটে নাই—শৈশবে—তাহার বেশ মনে পড়ে—পিতার চারখানা লাঙ্গল, বাট্ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমী, ও একখানা খুব বড় ফলকর বাগান ও পুকুর ছিল—তাহার আয়ে তাহাদের সংসার বেশ স্বচ্ছন্দে চলিত এবং তাহার পিতা নিতাই মণ্ডল গ্রামের বারোয়ারীতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চাঁদা দিত। শৈশবে মাতৃহারা ও পিতার একমাত্র পুত্র বলিয়া নিতাই মণ্ডল অন্যান্য কৃষকদের মত পুত্রকে পাঠশালায় দেয় নাই—মা-মরা ছেলে, তাহাকে ছাড়িয়া থাকা তাহার পক্ষে বড় কষ্টকর হইত—গ্রামের গুরু মহাশয় দুঃখীরামকে ছাত্র শ্রেণীভুক্ত করিতে প্রয়াস পাইলে নিতাই বলিত "চাষার ছেলে লেখাপড়ায় কাজ কি ঠাকুর—আপনাদের আশীর্ব্বাদে যা রেখে যাচ্চি বুঝে চল্লে পায়ের উপর পা দিয়ে ওর জীবন কেটে যাবে—আশীর্ব্বাদ করুন যেন দুঃখী আমার নিরোগী হয়ে বেঁচে থাকে।"

তারপর তাহার পিতার মৃত্যু—তাহার পিতৃব্য নিমাই কর্ত্তৃক ছলেকৌশলে সমস্ত সম্পত্তি অপহরণ—সে সকল কথাই তাহার মনে পড়িল। কেহ যদি বলিত দুঃখী তুমি মামলা কর, তোমার বিষয় ফেরৎ পাইবে। দুঃখীরাম শিহরিয়া উঠিত—বলিত 'বাপ্ রে উনি আমার খুড়ো—সামান্য বিষয় নিয়ে ওঁর সঙ্গে কি আমি বিবাদ কর্ত্তে পারি, আমার একটা পেট—ভগবান অবশ্যই চালিয়ে দেবেন। বাবুরা কত ভদ্রলোকের ছেলে, আমরা মূর্খ-লোকের

* Star of India উপাধিধারী থলঘাট নিবাসী জগবন্ধু দত্ত।

মোকর্দ্দমা করা কি আমাদের কাজ?" কিন্তু বিমাই সেই অনাথ ভ্রাতুষ্পুত্রকে দুবেলা দুমুঠা অন্ন দিতেও কাতর হইত—অনেক লাঞ্ছনা অনেক অপমান নীরবে সহ্য করিয়া যেদিন পিতৃব্যের কৃপাদত্ত অন্নের উপর একটা ধিক্কার আসিল—সেদিন অভাগা বালক পৈতৃক গৃহ ত্যাগ করিল। অসহায় অনাথ উপার্জ্জনাক্ষম বালক একাকী সংসারে ভাসিল। ভিক্ষা ব্যতীত তাহার উপায় ছিলনা। গ্রামের প্রান্তভাগে এক পরিত্যক্ত—জীর্ণ কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। চাষার ছেলে কাজ কর্ম্ম কিছুই জানিত না সুতরাং গ্রামবাসীগণ দয়া করিয়া কেহ একবেলা খাইতে দিলে খাইত, নতুবা অনশনে দিন কাটিয়া যাইত। ক্ষুধার জ্বালায় যখন দুটী চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিত তখন তাহার প্রাণের ভিতর হইতে আকুল ভাবে এক করুণ স্বর উত্থিত হইয়া বলিত—"ভগবান এইবার দয়া করো, আমায় নাও।"

এত কষ্টে—এত বিপদেও দুঃখীরাম সাধ্যমত পরের উপকার করিত। পরের মড়া বহিতে, অসহায় রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে তাহাকে কখন অলস দেখা যাইত না। বারোয়ারীর সময় মাঠের বন কাটিয়া 'ম্যারাপ' বাঁধিয়া দেওয়া প্রভৃতি সে সব একাকী করিত। প্রত্যেক গ্রামবাসী কোন না কোন রকমে তাহার কাছে উপকৃত ছিল। কিন্তু দরিদ্রের উপকার কয়জন মনে করিয়া রাখে। তাই উদরান্নের জন্য ভিখারী হইয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইলে তাহারা তাহাকে ফিরাইয়া দিতে একটুকুও কুণ্ঠিত হইত না। বরং রোজ রোজ এরূপ ভাবে বিরক্ত করাতে অনেকেই ক্রুদ্ধ হইত। তারপর একদিন গ্রামের এক রোগীর জন্য দুঃখীরাম সহরে ঔষধ কিনিতে আসিয়া হতভাগ্য ট্রাম গাড়ি চাপা পড়িল। সেই মাসের পর হস্পিট্যাল হইতে অস্থি কাটাই সে দেশে প্রত্যাগমন করিল। কিন্তু এই পরোপকারার্থে তাহার দুইখানি পাই সে খোয়াইয়াছিল, এখন দুইটী লাঠির উপর ভর দিয়া ভিন্ন সে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারিত না। দুঃখীরামের খঞ্জ গ্রামের বালকদের বেশ একটা উপহাসের উপভোগ্য বিষয় হইতেছিল। এইরূপে কষ্টে,ক্ষুধায়, নিরাশায় দুঃখীরাম দিন কাটাইত, তথাপি শৈশবের সুখময়-স্মৃতি-বিজড়িত সে গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সে ভাবিত এ গ্রামের লোক ভিক্ষা দিক্ বা না দিক্ তথাপি তাহারা আমার পরিচিত ও প্রতিবাসী। অপরিচিতের নিকট ভিক্ষার্থ গিয়া অপমানিত হওয়াপেক্ষা নিজের গ্রামের লোকের কথা শুনাও ভাল।

তিন দিনের পর যখন বৃষ্টি ধরিল, গ্রামের পথ হইতে তখন আবদ্ধ জলরাশি অন্তর্হিত হইয়া কর্দ্দম-চিহ্ন রাখিয়া গেল। ক্ষুধা-ব্যাকুল খঞ্জ তাহার সেই বাঁশের লাঠি দুটীর নেকড়াজড়ানো মাথা দুটি বগলে দিয়া সেই কর্দ্দম ক্লিষ্ট পথে খাদ্যান্বেষণে বাহির হইল। তিন দিনের ক্ষুধায় রুগ্ন শরীর ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। দু চারি পা যায় আবার পথ-পার্শ্বস্থ কোন এক গাছে হেলান দিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করে। এইরূপে অতি কষ্টে কিছু দূর গিয়া, তাহার সেই শৈশবের লীলা-ভূমি—সেই পিতৃ-ভবন দৃষ্টিগোচর হইল। সেই উঁচু ছাউনী দেওয়া, সেই ক্ষুদ্র কুটীর সেই উচ্চ দাওয়া যেখানে সে কত দিন বাপের কোলে বসিয়া

কণ্ঠ গ্রাস করিয়াছে। সেই দাওয়ার সম্মুখে তাহারি পিতৃব্য নিমাই মণ্ডল বসিয়া ধূমপান করিতেছে ও গ্রামের কয়েক জন মণ্ডিতকের সঙ্গে কথা কহিতেছে। অনেক দিনের সঞ্চিত পুঞ্জীকৃত শুষ্ক বিষাদ-রাশি তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন অশ্রু আকারে, ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। একবার ভাবিল, না ও বাড়িতে আমি প্রাণ থাকতে ভিক্ষে কর্ত্তে যাবো না কিন্তু আবার পেটের জ্বালা, ক্ষুধার দারুণ যন্ত্রণা তাহার পর হৃদয়ের সমস্ত প্রবৃত্তি বিসর্জ্জন দিয়া হীনতা দৈন্য একত্রিত করিয়া বলিল "খুড়ো-মশাই আজ দুটী খেতে দেবেন।" নিমাইর পার্শ্বে রামলোচন চক্রবর্ত্তী বসিয়া রূপা বাঁধান হুঁকায় তামাক খাইতেছিল, সে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল "কেন হে বাপু, তোমার খুড়োর কি ঐশ্বর্য্য দেখেছ—ও ছাঁপোষা লোক তোমার মতীর খোরাক রোজ রোজ যোগায় কোথেকে বলত ?" অনুমোদনের ভাবে ঘাড় নাড়িয়া নিমাই বলিল "বলুন ত দেবতা! ছাঁপোষা লোক নিজেই খেতে পাই না—আমার কি পরের ভাবনা ভাবা চলে—"

ঘৃণা লজ্জা যেন মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়া তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল—বক্ষের মধ্যে রুদ্ধ আবেগ যেন তাল পাকাইয়া উপরে ঠেলিয়া আসিতে লাগিল; নির্ব্বাক নিষ্পন্দ সেই পর মুখাপেক্ষী অবনত মস্তকে সে স্থান ত্যাগ করিল—যাইবার সময় শুনিল পশ্চাতে অর্দ্ধস্ফুট-স্বরে কে বলিল "বেটার তেজ দেখনা, যেন নবাব-পুত্তুর। ব্যাটা গাঁয়ের সমস্ত লোককে জ্বালিয়ে মারে—যেন সবাই এর কাছে খত লিখে রেখেছে—আবার কথায় কথায় রাগ হয়—এক গাঁয়ে কি রোজ ভিক্ষে চলে?" দুঃখীরাম বুঝিল এ তার পিতৃব্যের কণ্ঠস্বর। বাণবিদ্ধ হরিণের ন্যায় অস্থির হইয়া দুঃখীরাম সে স্থান ত্যাগ করিল। কিন্তু—হা ভগবান্! আর চলিবারও যে শক্তি নাই কেমন করিয়া সে গ্রামান্তরে যাইবে, সেই সব অপরিচিতের মধ্যে কাহার কাছে সে শুষ্ক মুখে দুটী খাবার প্রত্যাশী হইয়া দাঁড়াইবে—তবুও যাইতে হইবে; পেটের জ্বালা অপমানে তাচ্ছিল্য বিদ্রূপ কাহাকেও ভ্রূক্ষেপ করেন না।

ধীরে ধীরে সেই কর্দ্দমময় পথ অতিক্রম করিয়া, লাঠীর উপর ভর দিয়া চলিল। খানিক দূর গিয়া দেখিল, পথি-পার্শ্বে তাহাদের সেই ফলের বাগান, সেই সকল চিরপরিচিত তরু-লতা, যাহাদের অঙ্গে শৈশবে কতদিন সে আরোহণ করিয়া ফল পাড়িয়াছে, যাহারা জননীর মতন স্নেহে ও করুণায় তাঁহাকে ক্ষুধার আহার দিয়াছে, সেই সব গাছ-পালা, ঐ তাহার স্বহস্ত রোপিত ফজলী আমের গাছ; ঐ লিচুর গাছ সুপক্ব-ফলের ভরে আজ তাহারা অবনত, অনেকদিনের পরিচিত ক্ষুধাকাতর সেই শিশু-টীর আহারার্থে তাহার সুপক্ব ফল-ভার লইয়া যেন প্রতীক্ষা করিতেছে সেই সুপক্ব ফলস্তবক দর্শনে তাহার মনে একটা দুর্দ্দমনীয় লোভ জন্মিল। আবার ভাবিল ছি! চুরি—সে যে বড় নীচ কাজ কিন্তু বুভুক্ষিত জঠরাগ্নি তাহার হৃদয়কে পরাস্ত করিল। একটা গাছে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া নীচের ডালে যে লিচু পাকিয়াছিল সে সেই গুচ্ছটী ধরিয়া একটা সুপক্ব ফল মুখে দিল। তিনদিনের অনাহারের পর একটা সুমধুর সুপক্ব ফল, কত মধুর! শরীর যেন জুড়াইয়া আসিতেছিল আর একটী ফল তুলিয়া মুখে দিতে যাইবে—এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে

একজন তাহার পৃষ্ঠে বিষম আঘাত করিল— "বাবারে গেলুম" বলিয়া ভিখারী ভূপতিত হইল। তাহার বোধ হইল যেন, পদতল হইতে পৃথিবী সরিয়া যাইতেছে মূর্চ্ছাহত দুঃখীরাম যেন একবার অস্পষ্টভাবে দেখিল আঘাতকারী তাহার পিতৃব্যপুত্র গোবর্দ্ধন। তারপর চৈতন্য হারাইয়া ভিখারী ভূপতিত হইল। লাঠি ঠুকিয়া বিষম দম্ভে গোবর্দ্ধন বলিল "তবে রে শালা চোর! রোজ রোজ ফল চুরি করে খাবে—আবার ভিরকুটী, ওঠ শালা টানিয়া তুলিতে গিয়া দেখিল খঞ্জ অচৈতন্য। গোবর্দ্ধনের প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হইল গ্রামের লোকদের ডাকা হইল—রামনারাণ চক্রবর্ত্তী বলিলেন "চৌকিদারকে ডাকিয়ে ওকে হাজতে দাও" তখন সকলে সেই প্রস্তাব অনুমোদন করিল। চৌকিদার আসিলে সকলে সেই অচৈতন্যকে ধরাধরি করিয়া একটা ঘরে পুরিয়া রাখিল। পাছে খোঁড়া পালাইয়া যায়। কিন্তু তিনদিনের অনাহারীকে যে কিছু খাইতে দিতে হইবে বা মুর্চ্ছিতের মুখে একবিন্দু জল দিতে হইবে, একথা কারও মনে উঠিল না। মূর্চ্ছা-ভঙ্গে যখন ভিখারী চক্ষু মেলিল তখন দেখিল চারিদিকের গাঢ় অন্ধকার তাহাকে গ্রাস করিয়াছে, সে যে কোথায় আছে তাহা বুঝিতে পারিল না। গাত্রে দারুণ বেদনা অনুভূত হওয়াতে তাহার সকল কথা মনে পড়িল। অনুভবে বুঝিল সে কোন এক গৃহে আবদ্ধ। ভিজে মাটির স্যাঁৎসেঁতে মেঝে হইতে একটা সোঁদা গন্ধ উঠিয়া চারিদিকে যেন এক ভীষণতার সৃষ্টি করিতেছিল—দূর হইতে দমকা হাওয়া অন্ধকারে বিরাট দৈত্যের মত ছুটিয়া আসিয়া সেই কুটিরের রুদ্ধ জানালায় আঘাত করিতে লাগিল। ভিখারী কাতর-কণ্ঠে [illegible], আমায় মুক্তি দাও প্রভু" ক্ষুৎপিপাসাতুর আর কথা কহিতে পারিল না—অন্ধকারে সেই ভিজে মেঝের উপর অবশ হইয়া পড়িয়া গেল।

চৌকিদার জনার্দ্দন পরদিন প্রাতে মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া হাতে লাঠি লইয়া আসামীকে যখন হাজতে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সকলে দেখিল—গৃহের মেঝে একটি মৃতদেহ—মৃতের মুখে যেন ক্ষুধা তৃষ্ণা উৎকণ্ঠা আবেগ অপমান ঘৃণা সব এক সঙ্গে ফুটিয়া রহিয়াছে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কয়েদ।

কে হে তুমি মায়াবী?—সজল-নয়ন দুটি;
কি দেখিছ আড়চোকে, হাসিতেছ মিটি মিটি?
জগতে কি নাহি স্থান?—কেন তুমি বরাননা
আমার হৃদয়ে এসে করিতেছ আনাগোনা?
দিন নাই, রাতি নাই, সুসময় অসময়
সদাই বিরাজ একা, হৃদে কি নাহিক ভয়?
প্রত্যহ স্বপনে এসে কেন কর আলিঙ্গন,
জাগিয়ে পাইনা খুঁজে কোথা কর পলায়ন?
চিনেছি তস্কর তুমি, করিছ হরণ—
জাগায়ে [illegible] তৃষ্ণা আমার [illegible]।
বুঝেছি ছলনাময়ী বুঝেছি তোমার [illegible];
যেমন করেছ কর্ম্ম তেমনি [illegible] প্রতিফল,
উপযুক্ত শাস্তি তব মম হৃদি-কারাগার;
[illegible] মুক্তি পাবে না জীবনে আর

শ্রী[illegible]।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

A GUIDE TO JAPAN.—By R. Palit. ইহা জাপান যাত্রীর অতি আবশ্যকীয় পুস্তক, মূল্য ১৲ টাকা। গ্রন্থকার জাপানের ইতিহাস, তাহাদের ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনৈতিক বিষয় অতি বিশদভাবে এই পুস্তকে আলোচনা করিয়াছেন। অসভ্য জাপান এই সামান্য দিনের মধ্যে কিরূপে উন্নতির চরম সীমায় উত্তীর্ণ হইয়া সভ্য জগতকে স্তম্ভিত ও মোহিত করিয়াছে, কিরূপে তাহাদের এরূপ পরিবর্ত্তন হইল; এক্ষণে জাপানের সভ্যতা তাহাদের রীতিনীতি যে সভ্য জগতের আদর্শ, গ্রন্থকার তাহা এই পুস্তকে প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই। পুস্তকের কাগজ ও ছাপা মনোজ্ঞ, কলিকাতা-চাঁপাতলার ধর কোম্পানী ইহার প্রকাশক, তাহাদের নিকট ইহা প্রাপ্তব্য।

কহিনুর।—একখানি মাসিক পত্র, ফরিদপুর পাংশা হইতে প্রকাশিত। পত্রিকাখানি অনেক দিন চলিতেছে কিন্তু সময়ে সময়ে ইহার তিরোভাবও হইয়া থাকে, বহুদিন ইহার দর্শন পাই নাই। আবার দর্শন দিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি স্থাপন উদ্দেশে ইহার প্রচার; উদ্দেশ্য মহৎ ও প্রশংসনীয় বটে কিন্তু এ উদ্দেশ্য সফল হওয়া অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার, যাহা হউক, আমরা সহযোগীকে কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইয়া সুনিয়মে কার্য্য করিতে দেখিলে সুখী হইব।

যোগী সখা।—ইহা একখানি জাতীয় পত্রিকা, কয়েক বৎসর বেশ চলিতেছে; অনেক কৃতবিদ্য ও ধনী ব্যক্তি ইহার পরিচালনে নিযুক্ত, এইজন্য আশা করা যায়—ইহা সুনিয়মে পরিচালিত হইয়া আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিবে।

মণিলাল এণ্ড কোম্পানী।—জুয়েলারী কার্য্যে ইঁহারা যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। কেমিক্যেলের স্বর্ণের পরিবর্ত্তে মায়াপুরী মেটেলের আবিষ্কার করিয়া মণিলাল কোম্পানী কলিকাতা সহরে বেশ পসার প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়াছেন। ইহাদের নিকট আসল স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কারাদিও পাওয়া যায়। গঠন-পরিপাটি, নুতন নুতন প্যাটানের দ্রব্যাদি ইহারা যেরূপ দক্ষতার সহিত আবিষ্কার করেন তাহা দেখিলে বাস্তবিক মোহিত হইতে হয়। ইহারা কখন অবিশ্বাসের কার্য্য করেন না। আমাদের জনৈক বন্ধুর বিবাহে ইহাদের নিকট যাবতীয় স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার প্রস্তুত করিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে ইহারা যেরূপ সততার সহিত কাজ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি তাই আমরা সাধারণকে ইহাদের নিকট একবার পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি। এই কোম্পানীর সকলেই শিক্ষিত এবং অমায়িক প্রকৃতি। ভগবান সর্ব্বতোভাবে ইহাদের উন্নতি বিধান করুন, ইহাই প্রার্থনা।

মঙ্গলাচরণ।

রাঙ্গা চরণ।

১

ও রাঙ্গা চরণ, লইনু শরণ
ভয় কি জীবনে মরণে,
পারে কি আমায় বাঁধিতে হেতায়
সংসার অনিত্য ভবনে।
কাম ক্রোধ মোহ, সদা অহরহ
যুঝুক আমারি সনে,
সদা জয়ী হ'ব চরণে দলিব
'রাঙা চরণের' গুণে।

২

(ও)গো! হাসিয়ে হাসিয়ে হৃদয়ে আসিয়ে
দাঁড়াও আরূঢ় হয়ে।
চরণ পরশে হৃদি পদ্ম হেসে
যাক— আঁধারে বিজুলি ব'য়ে,
আমি ঘুচে যাক্ বিশ্বে প্রেম হোক
পরকে আপন জানি,
পরের আপদ পরের বিপদ
যেন আপন বলিয়া মানি।
ভব কারাগারে তবে ত'রে যাবে
নাহি রবে কোন ভয়,
হৃদয়েতে ভয় হইলে উদয়
দিও রাঙা চরণ আশ্রয়।

শ্রীলালগোপাল মিত্র।

"এক কোপীনকা ওআস্তে।

কোন অরণ্যে এক সাধু ছিলেন। তিনি ফল মূল ও কন্দাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। কুঠিরাদি না থাকায় বৃক্ষের নিম্ন দেশেই অবস্থান করিয়া বর্ষার জল, শীতের হিম এবং গ্রীষ্মের প্রচণ্ড সূর্য্যকর হইতে আপনাকে রক্ষা করিতেন। এই অরণ্যের সন্নিকটে লোকালয় ছিল। সুতরাং তত্ত্ব-জ্ঞান-লুব্ধ ব্যক্তিরা সময়ে সময়ে তাঁহার নিকট আসিয়া ভগবৎ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিষয়াশক্ত চিত্তে কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়া যাইতেন। এইরূপে সাধুকে মধ্যে মধ্যে জন সমক্ষে উপস্থিত হইতে হইত বলিয়া লজ্জাবরোধক কৌপীন অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

সাধু প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নদীতে অবগাহন করিয়া শুষ্ক কৌপীন ধারণ ও আর্দ্র কৌপীন পরিবর্ত্তন করিতেন এবং উহা শুষ্ক করিবার জন্য বৃক্ষের শাখায় রাখিয়া দিতেন।

কিছুদিন এইরূপে অতিবাহিত হইলে পর সাধু একদা কৌপীন পরিবর্ত্তন কালীন দেখিলেন যে, ইন্দুরে উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছে। তিনি অগত্যা নূতন কৌপীন পরিধান করিতে বাধ্য হইলেন। সাধু যতই নূতন কৌপীন ব্যবহার করিতে লাগিলেন

ইন্দুর ততই নষ্ট করিতে লাগিল। সাধু ক্রমে কৌপীনের জন্য নিতান্ত চিন্তিত হইয়া গ্রাম্য লোকের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বিড়াল পুষিবার জন্য পরামর্শ দিল। সাধু তৎক্ষণাৎ গ্রাম হইতে একটী বিড়াল শাবক আনয়ন করিলেন এবং তৎপর দিবস হইতে তাঁহার কৌপীন বিনষ্ট হওয়া স্থগিত হইয়া গেল। সাধুর আনন্দের আর সীমা রহিল না।

বিড়াল স্বভাবতঃ মৎসাদি এবং দুগ্ধ ব্যতীত আহার করিতে পারে না। অরণ্যে সাধুর নিকট যাইযাও সে ভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারে নাই। সুতরাং সাধুর সহিত ফলমূল ভক্ষণ করিতে পারিত না। আহার ব্যতীত উহা ক্রমে জীর্ণ শীর্ণ হইতে লাগিল। সাধু তখন কৃষ্ণের জীব এবং তাঁহার উপকারী জ্ঞানে গ্রাম হইতে বিড়ালের জন্য দুগ্ধ ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন।

কিয়দ্দিবস পরে কোন ব্যক্তি বলিল—যে সাধুজী আপনাব প্রত্যহ দুগ্ধের প্রয়োজন, দুই এক দিবস ভিক্ষায চলিতে পারে। বারমাস কে আপনাকে দুগ্ধ ভিক্ষা দিবে? আপনি একটী গাভী আনয়ন করুন, তাহাতে প্রচুর দুগ্ধ হইবে; আপনি এবং আপনার বিড়াল উভয়েই পরিতৃপ্ত রূপে দুগ্ধপান করিতে পারিবেন'। সাধু এই পরামর্শ নিতান্ত অবস্থা-সঙ্গত জ্ঞান করিয়া অবিলম্বে তাহাই কবিলেন। সাধুকে আর দুগ্ধ ভিক্ষা করিতে হইল না।

কালসহকারে সেই গাভীর বৎস হইতে লাঙ্গল এবং উহাদের জন্য বিচালী সংগ্রহ করা ক্রমে প্রয়োজন হইয়া উঠিল। তখন সাধু পুনরায় গ্রাম্যলোকদিগের পরামর্শে পতিত জমিতে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিলেন। তদ্দারা ধান, কড়াই ও বিচালী অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইতে লাগিল। কৃষিকার্য্যের জন্য কৃষক নিযুক্ত ও তাহাদের জমা খরচ এবং ধান্যাদির হিসাবে সদাই নিযুক্ত হইতে হইল। যখন ধান চাল সঞ্চিত হইয়া আসিল তখন তাহা রক্ষার্থ গোলাবাড়ী ও বিচালী দ্বারা সাধুর নিজের ও ভৃত্য গবাদির গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া মহা ব্যস্ত হইয়া দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

একদিন সাধু আপন গৃহ প্রাঙ্গণে ভৃত্যাদি ও গ্রামবাসীদিগের সহিত অন্যান্য বৈষয়িক কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন ইতি মধ্যে তাঁহার গুরু আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে বিস্মিত হইয়া সাধুর কোন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এই স্থানে একটী উদাসীন থাকিতেন। তিনি কোথায় গিয়াছেন?' গুরু এই কথা বলিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, হয ত তাঁহারই ভ্রম হইয়া থাকিবে। তিনি ভুলিযা কোন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইযাছেন। ভৃত্য কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিল না। পক্ষে তিনি ঐ সাধুব বাটীব মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সম্মুখে তাঁহার শিষ্যকে দেখিযা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! এ সকল কি?" শিষ্য অপ্রতিভ হইয়া, অমনি গুরুব চরণে প্রণতিপূর্ব্বক বলিলেন—"প্রভু! এক কৌপীনকা ওআস্তে।" এই বলিয়া তাঁহাব অবস্থান্তব হইবার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন এবং সেই সকল বিষয়াদি তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ কবিয়া গুরুর অনুগামী হইলেন।

তাৎপর্য্য।—সাংসারিক ব্যাক্তরা অহঙ্কপে

বন্ধনের উপর বন্ধন দ্বারা আপনাকে আপনি অজ্ঞাতসারে আবদ্ধ করিয়া থাকে। আত্মা সংরক্ষক জ্ঞান কৌপীন অজ্ঞান মূষীক কর্তৃক বিখণ্ডিত হওয়া নিবারণ হেতু যে সকল উপায় অবলম্বনের প্রণালী আছে, তাহাতে আশু উপকার হয় বটে কিন্তু এতদ্দ্বারা পরিশেষে সমধিক ক্লেশের কারণ হইয়া থাকে। তখন প্রকৃত উদ্দেশ্য বিলুপ্ত হইয়া বাহ্যিক কার্য্যেরই আড়ম্বর হইয়া পড়ে। যেমন আত্মরক্ষা হেতু বিদ্যাশিক্ষা, স্ত্রীলাভ এবং ধনোপার্জ্জনাদির নানাবিধ বিধি আছে। সংসার ক্ষেত্রে যাহাতে ভ্রমসঙ্কটে পতিত না হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানো-পার্জ্জন করা যায়, তাহার জন্য বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু ইহার দ্বারা অহংভাবের এতদূর প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে যে, অভিমানের কার্য্যেই সমস্ত সময়াতিবাহিত হইয়া যায়। চরিত্র রক্ষাই বিবাহের বিশেষ উদ্দেশ্য কিন্তু তাহাতে সন্তানাদি উৎপত্তি হইয়া নূতন চিন্তার স্রোত খুলিয়া দেয়। অর্থাৎ সন্তানের শারীরিক মঙ্গলামঙ্গল কামনা, তাহাদের পরিণয় কার্য্যাদি দ্বারা কুটুম্বাদির সহিত সম্বন্ধ রক্ষা, সন্তানাদির সন্তান হইলে আনন্দে অভি-ভূত হওয়া ইত্যাদি। শরীর রক্ষার্থ ধনো-পার্জ্জন। ধনের দ্বারা যেরূপ অভিমানের প্রাবল্য হইয়া থাকে, সেরূপ আর কিছুতে হইতে পারে না। ধনী ব্যক্তিরা যে প্রকার অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা আর কাহার অবিদিত নাই। মনুষ্যেরা এইরূপে আত্ম বিস্মৃত হইয়া কার্য্যের হিল্লোলে নিয়ত ঘূর্ণিত হইতেছে। যৎকালে তাহারা একেবারে আত্মহারা হয় তখন ভগবান গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিয়া থাকেন। এ স্থানে যদিও ভগবান্ পরিত্রাণ করিলেন সত্য কিন্তু পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হইলে কর্ম্ম ফল জনিত অশেষ দুঃখ ভোগ হইতে মুক্তি লাভ করিবার সম্ভাবনা। পরমহংসপদাবলী।

সূর্য্যই সর্ব্ববিধ শক্তির মূলীভূত কারণ।

আমাদের প্রত্যেকের স্বীয় স্বীয় শরীরে কতক পরিমাণ শক্তি অর্থাৎ কার্য্য সাধনোপ-যোগী পারকতা অবস্থিতি করে। বেগবতী নদীর স্রোতের প্রতিকূলে অগ্রসর হওয়ার সময়ে নৌকাবাহকেরা পেশীর সাহায্যে সমস্ত দিন সজোরে দণ্ড চালনা করে, এবং লৌহকার তাহার পেশীর প্রযত্নে প্রকাণ্ড হাতুড়ী ভয়ানক বেগে আঘাত করে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে কোন্ দ্রব্যের ধ্বংসনে এই শক্তি-সম্পন্ন ব্যাপার সম্ভূত হয়? নিশ্চয়ই শারীরিক উপাদান-ভূত ক্ষুদ্রাংশচয়ের ধ্বংসনে। শ্রমজীবী ব্যক্তি দীর্ঘ কাল এইরূপ পেশীর চালনা করিলে শারীরিক ক্ষুদ্রাংশচয় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এই ক্ষয় প্রতি-বিধান জন্য বিশ্রাম এবং তদীয় স্থান পূরণার্থ নূতন ও সতেজ ক্ষুদ্রাংশচয় গঠনোপযোগী আহারীয় দ্রব্যের অত্যন্ত প্রয়োজন, সুতরাং মূলে ভুক্ত দ্রব্য হইতেই মনুষ্যশক্তি সমুৎপন্ন হয়, আর অলস অপেক্ষা পরিশ্রমী ব্যক্তির অধিকতর কার্য্য-সাধন শক্তি আবশ্যক করে। অতএব পরি-শ্রমবিহীন কারারুদ্ধ ব্যক্তি অপেক্ষা পরিশ্রম-কারী কারাদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে অধিকতর পুষ্টিকর আহারের প্রয়োজন। স্থূল প্রাণীদের পক্ষে যেরূপ আহারের, বাষ্পীয় যন্ত্রের পক্ষে, তদ্রূপ ইন্ধনের প্রয়োজন। প্রভেদ মাত্র এই

যে প্রাণীগণ বাষ্পীয়-যন্ত্র হইতে অল্পতর আহারে অধিকতর কার্য্যসাধনে সমর্থ। এক মন শুষ্কতৃণ কোন বাষ্পীয় যন্ত্রে জ্বালাইলে যে পরিমাণ কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, উহা একটা অশ্বকে আহার করাইলে তদপেক্ষা অধিকতর কার্য্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাস্তবিক খাদ্য দ্রব্যসমূহ শরীরাভ্যন্তরে দগ্ধীভূত হইয়াই কার্য্যসাধন শক্তি উৎপাদন করে এবং শরীর পোষণোপযোগী সমস্ত খাদ্য দ্রব্যই শুষ্কাবস্থায় আগুনে জ্বালান যায়। এতদ্দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে যে ভুক্তদ্রব্যই আমাদের শারীরিক শক্তির মূল। কোথা হইতে ভুক্তদ্রব্য এই শক্তি প্রাপ্ত হয়? আমরা উদ্ভিদ্‌ভোজী হইলেও ইহার উত্তরের জন্য অধিক দূর যাওয়া নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু যদি আমিষভোজী হই, আর মৎস্য, পশু পক্ষ্যাদি আহার করিয়া ইহাদের শক্তির কিয়দংশ স্বীয় শরীরে প্রবিষ্ট করিয়া থাকি, তবে জিজ্ঞাস্য এই যে মৎস্য, পশু, পক্ষ্যাদি কোথা হইতে এই শক্তি প্রাপ্ত হইল? তৃণজীবী মৎস্য এবং পশু পক্ষ্যাদি নিরামিষভোজী মনুষ্যের ন্যায় স্বীয় স্বীয় শক্তির জন্য উদ্ভিদরাজ্যের নিকট ঋণী, আমিষ-ভোজী মৎস্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর জলজ তৃণাদি মৎস্য আহার করিয়া পরিপুষ্ট হয়। অতএব প্রতীয়মান হইতেছে যে, উদ্ভিদরাজ্যই উভয় আমিষ ও উদ্ভিদ্‌ভোজী ইতরপ্রাণী এবং মনুষ্য গণের শারীরিক শক্তির মূল। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে উদ্ভিদন্তর্নিহিত শক্তি কোথা হইতে উৎপন্ন? এই প্রশ্নের সদুত্তর করিতে হইলে বৃক্ষাদি পত্রে বাস্তবিক কি ব্যাপার সংঘটিত হয় অগ্রে তাহা নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। রাত্রি-কালে বৃক্ষপত্র অম্ল-অঙ্গারকবাষ্প ভূবায়ু হইতে শোষণ করে, দিবাভাগে সৌরকর বৃক্ষপত্রে প্রবেশ করিয়া এই অম্ল অঙ্গারক, অম্লজান ও অঙ্গারক উপাদান পৃথক করে। এই উন্মুক্ত অম্লজানবাষ্প ভূবায়ুতে প্রবেশ করে, আর অঙ্গারক কোনও না কোন প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়া বৃক্ষাদির কার্য্য সাধনোপযোগী স্বরূপে পরিণত হয়।

আমরা দেখিতেছি যে বৃক্ষপত্রস্থ এই ক্রিয়া সামান্য অগ্নির অবিকল বিপরীত। অগ্নিতে ইন্ধনস্থ অঙ্গারক ভূবায়ুর অম্লজানসহ সম্মিলিত হইয়া অম্ল অঙ্গারক বাষ্প উৎপাদন করে, আর এবম্বিধ পরস্পর আকর্ষণক্ষম দ্রব্যদ্বয়ের সংযোগে তাপ ও আলোক উৎপন্ন হয়, পক্ষান্তরে বৃক্ষ-পত্রে এই পরস্পর আকর্ষণক্ষম দ্রব্যদ্বয় সৌরকরতেজে পৃথক হয়, আর যেন সৌরকর-তেজ অম্লজান ও অঙ্গারক পৃথককরণকালীন তন্মধ্যে রূপান্তরিত হইয়া কার্য্যসাধন শক্তিতে পরিণত হয়। এই অঙ্গারক হইতে উদ্ভিদাদির দারুময় তন্তুচয় প্রধানতঃ নির্ম্মিত, ইহা এক প্রকার কার্য্যসাধন শক্তি বিশেষ, অগ্নিজ্বল-নাদি কার্য্যে অম্লজান সহ পুনর্ম্মিলন সময়ে ইহার অধিকাংশ শক্তি আবির্ভূত হয়। কাষ্ঠদ্বারা আগুন জ্বালাইলে এই শক্তি তেজে পরিণত হয় আর মনুষ্য বা ইতর প্রাণীকর্ত্তৃক উদ্ভিদাদিভুক্ত হইলে, ইহা রক্তমাংসাদিতে পরিণত হইয়া পরিণামে শারীরিক তাপ ও কার্য্যক্ষমতা উৎ-পাদন করে। এবম্বিধ প্রকারে এই পরমাশ্চর্য্য ব্যাপারের প্রতিপদ আমরা নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইতেছি:—আদৌ সৌরকরে উদ্ভিদাদির অঙ্গারক-আহার প্রস্তুত হয়, তৎপরে মৎস্য ছাগাদি খাদ্য প্রাণীচয় কর্ত্তৃক ঐ সমস্ত উদ্ভিদ আহার স্বরূপে ভুক্ত হয় এবং পরিণামে এই খাদ্য প্রাণীদের মাংসাদি আমিষভোজী মনুষ্য

এবং ইতর প্রাণীদিগের শরীরে ভুক্তদ্রব্য প্রবিষ্ট হইয়া ইহাদিগকে পুষ্ট ও কার্য্যক্ষম করে, অর্থাৎ উদ্ভিদভোজী মনুষ্য ও ইতর প্রাণীরা প্রত্যক্ষরূপে এবং আমিষভোজী বা প্রাকবাস্তরে উদ্ভিদ-রাজ্য হইতে স্ব স্ব আহার সংগ্রহ করিয়া কার্য্যসাধনোপযোগী শক্তি প্রাপ্ত হয়, আবার সৌরকর এই উদ্ভিদরাজ্যের আহার প্রস্তুত করে, অতএব সূর্য্যই মনুষ্য ও ইতর প্রাণীগণের কার্য্যসাধনোপযোগী শক্তির মূলীভূত কারণ।

যে সমস্ত উদ্ভিদাদি ভুক্তদ্রব্য স্বরূপে প্রত্যক্ষভাবে বা প্রাকারান্তরে প্রাণীদের শরীরে প্রবিষ্ট না হয়, তাহারাও বাষ্পীয়যন্ত্রে ইন্ধনস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া প্রযোজনীয় কার্য্যে পরিণত হয়। অপিচ করুণাময় পরমেশ্বর যেন আমাদের বর্ত্তমান যুগের অভাব পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াই ভূগর্ভে রাশীকৃত পাথুরিয়া কয়লার অসীম খনি সঞ্চিত রাখিয়া তদ্দ্বারা এক্ষণে ভূয়োভূয়ঃ উপকার সাধন করিতেছেন। এই খনিজ কয়লা পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের কোন জাতীয় বৃক্ষ-বিশেষের কাষ্ঠ মাত্র।

খাদ্যদ্রব্য ও ইন্ধন নির্ম্মাণ ব্যতিরেকে সৌরকর-তেজে আরও বিবিধ বল-সম্বলিত কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। জল বা বায়ুর শক্তিতে যে পেষক গোধূমাদি শস্য চূর্ণ করে আর অনুকূল বায়ুবলে পালি তুলিয়া যে নাবিক পোত চালনা করে, ইহারা প্রত্যেকেই উদ্ভিদভোজী এবং মাংসাশী জীব বা বাষ্পীয় যন্ত্রচালকের ন্যায় কার্য্যসাধন শক্তির জন্য আমাদের তেজোপুঞ্জ সূর্য্যের নিকট ঋণী; কারণ সূর্য্যতেজে সমুদ্র নদী তড়াগাদির জল বাষ্পরূপে উপরে উত্থিত হইয়া মেঘ সমুৎপন্ন হয় এবং এই মেঘ শীতল বায়ুসংস্পর্শে বৃষ্টিরূপে বর্ষিত হইয়া জলপ্রপাতাদি আকারে ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নতল প্রদেশে পতিত হয়, এবং সৌরকরতেজেই ভূমিসংলগ্ন বায়ু উত্তপ্ত ও সুতরাং লঘু হইয়া উপরে উত্থিত হয়। আর চতুষ্পার্শ্বস্থ অপেক্ষাকৃত শীতল ও ভারী বায়ু তদীয় স্থান পূরণার্থ তদভিমুখে ধাবিত হয় ও এই আন্দোলন নিবন্ধন বায়ু-প্রবাহ সংঘটিত হয়। এই প্রকার সৌরকর তেজ সম্ভূত জলপ্রপাত ও বায়ু-প্রবাহের সাহায্যে, পেষক ও নাবিক যথাক্রমে শস্যচূর্ণন ও পোতচালনা কার্য্য নিষ্পাদন করে। কেবল জোয়ারভাটা ভিন্ন ভূমণ্ডলের আর সমস্ত ব্যাপারের মূলীভূত শক্তিই সূর্য্য। এই সৌরকর তেজেই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে এবং বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, এই শক্তিতেই উপরে মেঘ সমুৎপন্ন হইয়া বৃষ্টিরূপে ভূতলে পতিত হয় এবং নদ্যাদির উৎপত্তি ও পরিবর্দ্ধন সংসাধিত ও উদ্ভিদ ও প্রাণীরাজ্য সংরক্ষিত হয়। ইহারই প্রভাবে বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপাদিত হয়; বসুন্ধরা বৃক্ষরাজিতে পরিপূরিতা ও নব কুসুম পল্লবাদির-উদ্গমে সুশোভিতা হয় এবং ফলশস্যশালিনী হইয়া আহার যোগায়। এই শক্তিমাহাত্ম্যেই জলচর জলগর্ভে ক্রীড়া করিতেছে, খেচর আকাশ মার্গে উড্ডীন হইতেছে এবং ভূচর ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করিতেছে। এই তেজোপ্রভাবেই অশ্বাদি দ্রুতবেগে ধাবমান হইতেছে, পোতাদি বায়ু-প্রবাহে চালিত হইতেছে এবং বাষ্পীয় যন্ত্রাদি শত অশ্ববলে কার্য্যসাধন করিতেছে।

সূর্য্যে এই সকল শক্তি নিহিত জানিতে পারিয়াই, বোধ হয় আর্য্যঋষিগণ বৈদিক কাল হইতে সূর্য্যকে উপাস্য দেবতা বলিয়া স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়ং-

ক্রালে তদুদ্দেশে সাবিত্রী গায়ত্রীরূপ মহামন্ত্র পাঠ করিতে ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বাধ্য করিয়াছেন। "সৌর-তেজই যে জীবের উৎপত্তি ও পরিপুষ্ট হয় এবং জীবমাত্রেরই গতি যে ঐ তেজসম্ভূত, বেদের অনেক স্থলে তাহার নির্দ্দেশ আছে।"

যে মহাপুরুষ সূর্য্যকে এইরূপ তেজো-বিশিষ্ট করিয়া অতীব সুকৌশলে চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ এই ত্রিবিধ রাজ্যের-উদ্ভব ও ও পালন সংসাধন করিতেছেন, তাঁহার অনন্ত শক্তি ও অপরিসীম তেজোপুঞ্জ মানবীয় বুদ্ধির অচিন্তনীয় এবং কল্পনারও অতীত।

শ্রীশ্রীনাথ শিকদার।

কু কি সু হয়? কৃষ্ণ কি গৌর হয়?

আমি জনৈকা, কৃষ্ণবর্ণা, কুৎসিতা, কুরূপা বঙ্গনারী। জীবে যাহা দেখে তাহাই শিখে; সরল পিতা সরলা মাতার তত্ত্বাবধারণে লালিতা পালিতা হইয়া সরলা হইতে শিখিয়াছি। কিন্তু সংসারে প্রবেশ করিয়া জানিতে পারিতেছি সরলতা লোকে প্রশংসিত হইলেও নির্ব্বুদ্ধির নামান্তর মাত্র। লোকে প্রকাশ্যে না বলুক কার্য্যে জানা যায় যে, বোকা সেই সরল, সেই ভাল মানুষ, যাহার বুদ্ধি আছে, সে সরল হইতে পারে না। শৈশবাবধি শিক্ষা ও অভ্যাসের এমনি ফল, কু কি সু বলিতে পারি না, যে অদ্যাবধি মনে এক কথা রাখিয়া মুখে আর এক কথা বলা অভ্যাস কখনও করিতে পারিলাম না। কপটতাচরণ করিতে পারি না বলিয়া আমায় অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। যাহা হউক সে কষ্ট তবু সহা যায়। যে কষ্টের, যে যাতনার আজ উল্লেখ করিতে বসিয়াছি তাহা অপার ও অসহনীয়। পুস্তকাদি পাঠে বিশেষতঃ পিতার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শ্রবণে শিখিয়াছিলাম যেরূপ চন্দনের, আর সুরূপ কুরূপ দুইই সমান। যাহার মন সুন্দর, যাহার হৃদয় সুন্দর সে কুৎসিতই হউক, কুরূপই হউক সে প্রকৃত সুন্দর। মনের সৌন্দর্য্য জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত থাকে, এমন কি প্রাণান্তেও তাহার প্রভা লুপ্ত হয় না। যে দিন হইতে সংসারে প্রবেশ করিয়াছি, বিবাহ-বন্ধনের সার্থকতা বুঝিতে পারিয়াছি, পতিকে হৃদয়ের বন্ধু বলিয়া ভাল বাসিতে শিখিয়াছি, সেই দিন হইতে আমার সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইয়াছে, সেই দিন হইতে যাহা সার জানিয়া শিখিয়াছিলাম, তাহা অসার বোধ হইতেছে। বাবা শিখাইয়াছিলেন সুন্দর মনেরই আদর হয়, কিন্তু আমি প্রতিনিয়ত গোলাবী অধরের, চম্পক বর্ণের, সুঠাম দেহের, বঙ্কিম নয়নেরই সোহাগ দেখিতে পাইতেছি।

সুন্দর মনের আদর আমি বড় একটা দেখিতে পাই না, সকলে পূজা করে এখন সুন্দর দেহের। কৃষ্ণবর্ণ ও কুরূপদেহ ধর্ম্মের ভাণ্ডার স্বরূপ হইলেও ঘোর ঘৃণার পাত্র। যে সংসারে স্বামী স্ত্রীকে বা স্ত্রী স্বামীকে ঘৃণা করে সে সংসার কখন সুখের হইতে পারে না, বরং তথায় অহরহ নানাবিধ অমঙ্গল ঘটনা ঘটিতে থাকে। সম্পাদক মহাশয়! মনে করিবেন না, যে সমস্ত বঙ্গে আমি একা কৃষ্ণবর্ণা ও কুরূপা, আমার স্বামীই আমাকে ঘৃণা করেন, আর আমারই সংসার শুধু অন্ধকার সংসার।

আমি আপনাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি আমার মত কৃষ্ণবর্ণা, কুরূপার সংখ্যাই অধিক তাঁহারা সকলেই আমার সম ভাগ্যবতী, তাঁদেরও সংসার আমারই মত সুখের সংসার। যখন বঙ্গের অধিকাংশ গৃহ সুখের স্থান না হইয়া অসুখের ভাণ্ডার স্বরূপ, তখন গৃহে গৃহে প্রায় বঙ্গবামা আমার মত অহরহ অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে তখন এ বিষম রোগের কি কোন প্রতিকার হইবে না? প্রথম প্রথম মনে করিতাম ধর্ম্মের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এ রোগ উন্মূলিত হইতে থাকিবে, কিন্তু যখন ভাবিয়া দেখি পিতা আমায় যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই শিক্ষা, সেই উপদেশ বিস্তার করিবার জন্য ধর্ম্মসমাজ দুই তিন হাজার বৎসর ধরিয়া যৎপরোনাস্তি উদ্যোগ ও যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না তখন ধর্ম্মোপদেষ্টাগণের নিকট আমাদিগের মত অভাগিনীর উদ্ধারের আশা অল্প। শাক্য, ঈষা, মুষার নিকট যখন আমাদিগের দুঃখ অপনোদনের মন্ত্র পাইলাম না, তখন এই বিংশ শতাব্দিতে এ হেন বিজ্ঞানচর্চ্চার দিনে, হে সম্পাদক মহাশয়। আপনি ভিন্ন আর কাহার আশ্রয় গ্রহণ করি। দেখিতে পাইতেছি বিজ্ঞান অনেক অসম্ভব ও আশ্চর্য্য ঘটন ঘটাইয়াছে, মানুষকে বেলুনের সাহায্যে আকাশে উড়াইতে শিখাইয়াছে ছয়-মাসের রাস্তা ছয়-দিনের পথ করিয়াছে, দুই চারি শত কোশ দূরস্থিত ব্যক্তির কণ্ঠধ্বনি শুনাইতেছে, জল জমাইয়া বরফ করিতেছে লাল রং সাদা করিতেছে, আরও কত অঘটন ঘটাইতেছে। যে বিজ্ঞান এত আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পাদন করিতেছে সে কি আমাদিগের গাত্রের কৃষ্ণবর্ণ গৌরবর্ণ করিতে পারিবে না। বর্ণটা গৌর হলে তবু অনেক দোষ ঢাকা যায়। আমি বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছি, অনেক সুন্দরীর গায়ের রং যদি আমাদিগের গায়ের রংয়ের মত হতো তাহা হইলে আর তাঁহাদিগকে ঠমকে ঠমকে হেলে দুলে বা বক চিতিয়ে চলতে হতো না। অন্যথা যাক আমার আসল কথা এই তুমি বিজ্ঞান বলে আমাদিগের গায়ের কালো রং সুন্দর (গৌর) করিতে পারিবে না কি? তুমি হয়তো হাসিয়া উঠিবে, বলিবে গায়ের কালো রং কি গৌর হয়? হয় না কেন? যে সূত্র অবলম্বন করে Bleaching powder অথবা Chloride of Calcium সহযোগে লাল রং সাদা হয়, ঠিক সেই সূত্রধরে কি কৃষ্ণবর্ণ গৌর হতে পারে না? যাহা হয় নাই, তাহা কি কখন হতে পারে না? ইহার অর্থ কি? আমি জানি তুমি বাঙ্গালি, আমাদিগের এ গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করা তোমার কর্ম্ম নহে তোমা হতে আজো কোন নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উদ্ভাবন হয় নাই। রাগ করিও না বড় জ্বালায় জ্বলিতেছি তাই আর ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারিলাম না, দুই একটা কটু কথার প্রয়োগ করিলাম, আর তুমি সুবিজ্ঞ সম্পাদক তোমার আবার রাগ কি? যাহা হউক তোমায় একটা কার্য্য করিতে হইতেছে। আমাদিগের দুঃখের কথা জানাইয়া Huxley কে একখানি পত্র লিখিতে হইতেছে। সে পত্রে "কুকে সুক করিতে পার? এই গভীর প্রশ্নটার যেন উত্তর প্রার্থনা করা হয়। প্রশ্নটা বৈজ্ঞানিক মতে এইরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দিও:- বিজ্ঞান কি (১) কুরংকে সুরং, (২) কুনয়নকে সুনয়ন (৩) কুমুখকে সুমুখ (৪) কুমনকে সুমন

করিতে পারেন ইত্যাদি। যদি প্রশ্নের সব কয়টা ভাগের উত্তর দিতে না পারেন, প্রথমটার উত্তর দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করে লিখো বলি এই প্রশ্নের প্রথম ভাগের উত্তরের উপর অন্ততঃ এক কোটী লোকের সুখ দুঃখ, আশা ভরসা, জীবন মরণ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। দেখা যাউক তিনি কি করেন? নিতান্ত অভাগিনীদিগের কপাল, তাই যদি তিনি উত্তর দিতে না পারেন। নহিলে তো পারিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। যদি তিনি নিতান্ত আমাদিগের পাকা কালো রং সুন্দর করিতে না পারেন, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করো যদি গর্ভধারিণীদিগকে কোন ঔষধ সেবন করাইলে আমাদিগের ভবিষ্য কন্যাগণ নিশ্চয় গৌরবর্ণা হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারে। এরূপ কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন কি না? আহা! ঈশ্বরেচ্ছায় যদি তাহাও পারেন, তাহা হইলে ভবিষ্য জন্মা বঙ্গবামাগণের দুঃখের ভার অনেক লাঘব হয়। আমাদিগের কপাল পুড়েছে না আর পুড়তে বাকি আছে। আজকাল সাদায় কালোয় যে প্রভেদ হইয়াছে তাহা দেখিয়া বাস্তবিক চমৎকৃত হইতে হয়, আজকাল রূপ দেখে গুণ দেখে না। নতুবা কালোর বিবাহে তাহার আত্মীয় স্বজনকে এত কষ্ট পাইতে হয় কেন? সর্ব্ব গুণাধার লৌহের পরিবর্ত্তে পিতলের কাঠারীর এত আদর কেন? ইহাতেই না সমাজ উৎসন্ন গৃহস্থ শান্তি শূন্য হইয়াছে।

শ্রীমতী কৃষ্ণকুমারী দাসী

ধর্ম্ম প্রচার।

যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যাইতেছে সেই দিকেই ধর্ম্ম প্রসঙ্গ, ধর্ম্মালাপন এবং ধর্ম্ম প্রচারের স্রোত চলিতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। কি, খৃষ্টান, কি মুসলমান, কি হিন্দু সকলেই যেন মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। খৃষ্টানেরা চিরকালই ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া থাকেন কিন্তু হিন্দু মুসলমানদিগের এই নূতন ভাব অতি বিচিত্ররূপে প্রকাশ পাইয়াছে। মুসলমানেরা হিন্দুদিগের অপেক্ষাকৃত পশ্চাতে পতিত হইয়া আছেন। হিন্দুগণ কেহ ব্রাহ্ম কেহ বৈষ্ণব, কেহ শাক্ত, কেহ হরিভক্ত এবং কেহ কর্ত্তাভজা প্রভৃতি নানাবিধ স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া তাঁহাদের স্বতন্ত্র মত স্বীকার করিতেছেন। এইরূপে প্রায় সকলের মুখেই ধর্ম্ম কথা শ্রবণ করা যাইতেছে। কি বৃদ্ধ, কি যুবা, কি স্ত্রী, কি বিষয়ী কি বিবেকী, কি বৈরাগী এমন কি বালকেরা পর্য্যন্ত সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া গগনভেদী বক্তৃতা দ্বারা স্বদেশীয়দিগের মোহ তিমির বিদূরিত করিবার জন্য লম্ফ ঝম্ফ করিতেছেন। কখন বা মৃদঙ্গ করতাল সহকারে হরি নামের মহিমা প্রচার দ্বারা প্রতিবাসীর মনাকর্ষণ করিতেছেন, সময়ান্তরে অবধূত মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক আত্মতত্ত্বের নিগূঢ় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া দিতেছেন এবং কোন স্থানে সংবাদ পত্রে তত্ত্ব-বিষয়ক প্রসঙ্গ দ্বারা কার্য্য করিতেছেন। বহির্দেশ হইতে এই সকল কথা শ্রবণ বা দর্শন করিলে সহসা চমকিত হইয়া যাইতে হয় এবং মনে হয় যে বাস্তবিক ধর্ম্মের সময় আসিয়াছে। কিন্তু এই

ধর্ম্ম প্রচারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে মহা বিভীষিকা দর্শন করিয়া আতঙ্কে প্রাণ বায়ু স্থগিত হইয়া যাইবার উপক্রম হয়।

ধর্ম্ম প্রচার অতি গুরুতর কথা। ইহা কথার কথা নহে, ইতিহাস কিম্বা উপন্যাস নহে। ইহা এক জনের নিকট শ্রবণ করিয়া অথবা পুস্তক পাঠ দ্বারা কণ্ঠস্থ করিবার কর্ম্ম নহে। শাস্ত্রের অর্থ লাভ করিবার ক্ষমতা লাভ করিলেও প্রচারক হওয়া যায় না। প্রচারক হইতে হইলে সাধক হওয়া কর্ত্তব্য। পরে ভগবানের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি তাঁহার শ্রীমুখাৎ তত্ত্ব-কথা শ্রবণ করিয়া থাকেন সেই ব্যক্তি তত্ত্ব-রসের রসিক হইলে তিনি প্রকৃত প্রচারকের কার্য্য করিবার সুযোগ্য পাত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন।

বর্ত্তমান কালে আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রচারক এবং প্রচারিকা হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু প্রায় শতকরা ৯৯.৯৯জন সাধন ভজনের কোন সংশ্রব না রাখিয়া কেবল মহাত্মাদিগের বিচরিত গ্রন্থ একমাত্র অবলম্বন করিয়া বসিয়া আছেন। এই গ্রন্থ মতে এক্ষণে ধর্ম্ম প্রচার হইতেছে বলিয়া নানা মুনির নানা মতে নানাবিধ সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়া যাইতেছে। তন্নিমিত্তই কাহার সহিত কাহার সহানুভূতি নাই; কাহার প্রতি কাহার প্রেম দৃষ্টি নাই। যেন সকলেই সকলকে চিরশত্রু জ্ঞান করিয়া দ্বেষ, হিংসার প্রস্রবণ খুলিয়া দিয়াছেন। যাহাতে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে যথোচিত তিরস্কার করিতে পারেন, যাহাতে ছিদ্র বহির্গত করিয়া বিদ্রূপ করিতে পারেন, যে কোন প্রকারে তাঁহাদের ধর্ম্মভাবের কুৎসা করিতে সমর্থ হন, তাহাই প্রচারের বিশেষ উদ্দেশ্য কি? হইয়া উঠিয়াছে। খৃষ্টানেরা তাঁহাদের ধর্ম্মকেই জগতের অদ্বিতীয় ধর্ম্ম জ্ঞানপূর্ব্বক খৃষ্ট ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিরয় গমন অনিবার্য্য বলিয়া জ্ঞান করেন। মুসলমানদিগের মতে মহম্মদীয় ধর্ম্মে যাহারা দীক্ষিত নহেন, তাহারা কাফের শ্রেণীভুক্ত, সুতরাং তাহাদিগের পরিত্রাণ নাই। হিন্দুদিগের প্রত্যেক সম্প্রদায়িকেরা প্রত্যেককে কুসংস্কারক এবং ভ্রমান্ধ জ্ঞান করিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। যিনি নিরাকার ব্রহ্মোপাসক বলিয়া সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার মতে উপাসনা না করিলে কাহারও কল্যাণ হইতে পারে না। যিনি সাকার পূজার পক্ষপাতী হইয়া পৌত্তলিকতার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতেছেন, তাঁহার নিকট অন্য কোন ধর্ম্মভাব স্থান পাইতেছে না। যাঁহারা আত্ম-তত্ত্ববিদ্ হওয়াই ধর্ম্মের উচ্চতম অভিপ্রায় জ্ঞানে কর্ত্তা ভজা প্রভৃতি নানাবিধ ধর্ম্ম সংগঠিত করিয়াছেন, তাঁহাদের অভিপ্রায়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড করগ্রস্ত হইয়া গিয়াছে। বৈষ্ণবেরা মনে করেন যে ঈশ্বর লাভের প্রকৃত পন্থা তাঁহারাই লাভ করিয়াছেন এবং যাঁহারা বৈষ্ণব না হইবেন তাঁহাদের উপায়ান্তর নাই। তান্ত্রিকেরা পঞ্চমকারের সাধন ব্যতীত জগতে দ্বিতীয় সাধন প্রণালী, স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নহেন। অদ্বৈতবাদীরা তাঁহাদের অনুবর্ত্তী ব্যক্তি ব্যতীত অন্যের ঈশ্বর জ্ঞান ভ্রমাবৃত বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন।

ধর্ম্ম-প্রচারের এই সাধারণ অবস্থা। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইবে যে গ্রন্থানুযায়ী ধর্ম্ম স্থাপিত হইলে তাহা কি জন্য প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা না যাইবে এবং প্রকৃত ধর্ম্মই বা

সাধকেরা ভাব বিশেষে পরিচালিত হইয়া থাকেন। যখন সিদ্ধ হন, তখনও তাঁহাদের সেই ভাবেই থাকিতে হয়। কারণ ভাব অনন্ত, মনুষ্যের দ্বারা তাহা কখন পূর্ণরূপে আয়ত্ত হইতে পারে না। এ প্রকার সাধক যখন জীবের হিতার্থ তাঁহার সাধন ফল লিপি বদ্ধ করেন তখন তাহাতে সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই গ্রন্থ যাঁহারা পাঠ করেন তাঁহাদেরও সেইজন্য ভাব বিশেষে চিরকালই থাকিতে হয় এবং তাঁহারা অন্য ভাব লাভ করিতে কখন সমর্থ হইতে পারেন না।

যে সাধক ভাব বিশেষে সিদ্ধ হইয়াছেন তাঁহার ভাবের সহিত গ্রন্থ পঠনশীল সাধকের সম্পূর্ণ বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। কারণ শাস্ত্রকারেরা সাধন-সিদ্ধ ছিলেন এবং শাস্ত্র-বেত্তারা তাহা নহেন। সুতরাং পরস্পর প্রভেদ হইয়া যাইল। যে সাধক ভাব লইয়া ঈশ্বর দর্শন করেন, তাঁহার আর সাম্প্রদায়িক ভাব থাকিতে পারে না। তিনি ঈশ্বরের নিকটে গমন করিয়া দেখিয়া থাকেন যে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সাধকেরা নিজ নিজ পন্থায় তথায় উপস্থিত হইতেছেন। যেমন আমার মাতাকে আমি মা বলিয়া ডাকি, আমার পিতা তাঁহাকে স্ত্রী ভাবে সম্বোধন করেন এবং কেহ তাঁহাকে মাসী, পিসী মামী, ভগ্নি, কন্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে ডাকিয়া থাকেন। সকলেরই ভাব স্বতন্ত্র কিন্তু তাঁহারা প্রত্যেকে তাঁহাদের ভাবে এক অদ্বিতীয়াকেই লক্ষ্য করিতেছেন। সাধকেরা সেইরূপে তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় ভাবে ভগবানের নিকট গমন করিয়া অনন্তদেবের অনন্ত ভাব বুঝিতে পারেন। এই নিমিত্তই আমাদের প্রত্যেক শাস্ত্র স্বতন্ত্র ভাব প্রকাশ করিয়াও অদ্বিতীয় ঈশ্বর স্বীকার করিয়া নিয়াছেন।

যাঁহারা কেবল শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা ভাবের প্রকৃতার্থ বুঝিতে না পারিয়া বিষম বিভ্রাট উপস্থিত করিয়া থাকেন. এইরূপ জঘন্য সাম্প্রদায়িক ভাবের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান সম্প্রদায মণ্ডলীতে এইরূপ কার্য্য হইতেছে। তাঁহারা কেবল শাস্ত্রের দোহাই দিয়া অন্যান্য ভাবের নিন্দা করিতেছেন। তাঁহারা একবার শাস্ত্র বাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করিবেন না, একবার নয়ন মুদ্রিত করিয়া মস্তিস্ক চালনা করিবেন না, একবার প্রকৃত তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন না, কেবল কি উপায়ে দল বৃদ্ধি হইবে, কেমন করিয়া সংবাদপত্রে সম্প্রদায়ের বার্ষিক বিবরণ প্রকটিত করিয়া প্রশংসা লইবেন, কেমন করিয়া দুইজন সুবক্তার দ্বারা অন্যান্য সাম্প্রদায়িকদিগকে দশ কথা বলা হইবে, কি উপায়ে সাধারণ লোকের চিত্তাকর্ষণ ও তাঁহাদের দলবদ্ধ করা যাইবে, তাহারই অনুষ্ঠান চেষ্টা এবং সাধন হইতেছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, কোন্ সম্প্রদায়ে কয়জন প্রকৃত সাধু জন্মিলেন? কোন্ সম্প্রদায়ে কয়জন জীবন সংগঠন করিতে পারিলেন? কোন্ সম্প্রদায়ে কয়জন ব্যক্তি ঈশ্বর দর্শন করিয়া তদীয় প্রেম ভক্তি বিতরণ করিতে পারিয়াছেন? ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সম্প্রদায় স্থাপিত হইল, ঈশ্বরের নামে প্রচার কার্য্য আরম্ভ হইল। কিন্তু সে উদ্দেশ্যে কেবল দ্বেষ, হিংসা, দলবৃদ্ধি এবং সাম্প্রদায়িক-দিগকে কটু কাটব্য বলিতে পরিপক্কতা লাভ করিল। এ প্রকার সম্প্রদায়ে হইবে কি? এ

প্রকার প্রচারের দ্বারা কখন নিজেরই উপকার হইবে না, আত্মোন্নতি হইবে না, তখন অপরের কি হইবে? এবং যাঁহারা ব্যক্তিবিতণ্ডা জানিতেন না, তাঁহারা কতকগুলি বাক্যের পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। এই নিমিত্ত বলি যে, বর্ত্তমান ধর্ম্ম প্রচার প্রণালী, যাহাতে এই মুহূর্ত্তে স্থগিত হইয়া সকলে আপনাপন উদ্দেশ্য অর্থাৎ ঈশ্বরলাভের জন্য একচিত্তে চলিয়া যাইতে পারেন, তাহাই প্রত্যেক সাম্প্রদায়িকদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা বিবেচনা করিয়া থাকি।

সাম্প্রদায়িকদিগের জানা আবশ্যক যে জগতে সত্য ধর্ম্ম কি? কাহার পন্থা প্রকৃত এবং কাহার পন্থা মিথ্যা? একথা কেহ সিদ্ধান্ত করিয়া দিতে পারেন? কখন না। জগতে এমন কোন প্রণালী নাই, যাহা এক ব্যক্তি বা এক সম্প্রদায়ের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। খৃষ্টানেরা যখন বলেন যে খৃষ্টকে বিশ্বাস না করিলে মুক্তি হইবে না অথবা ব্রাহ্মেরা যখন পৌত্তলিকতায় অবনতি হয় বলিয়া চীৎকার করেন কিংবা বৈষ্ণবেরা তাঁহাদের ভাবকে বিশ্বব্যাপিনী বলিয়া আর্ত্তনাদ করেন, তখন মনে হয় যে ভগবানের অপেক্ষা পক্ষপাতী আর কেহ নাই। যে না খৃষ্টান হইবে, যে না ব্রাহ্ম হইবে যে না মুসলমান হইবে, যে না বৈষ্ণব হইবে, যে না কর্ত্তাভজা হইবে, তাহার পরিত্রাণ নাই। একথা কি অন্তর্যামী দয়াময় ঈশ্বরের নিকট শোভা পায়? মনুষ্যেরা আপনারা যেমন স্বার্থপর; আপনার স্ত্রী, পুত্র ও আপনার আত্মীয় যেমন আদরের সামগ্রী; তেমনি ঈশ্বরকে মনে করিয়া থাকেন। তাঁহারা আপন আদর্শে ঈশ্বরকে সংগঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। ইহা স্থূল বুদ্ধি প্রসূত, যারপরনাই সঙ্কীর্ণ ভাববিশেষ। ভগবানকে জানিতে হইলে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা চাই। তাহার পর তাঁহার সম্বন্ধীয় কথা বলিবার সময়। নতুবা বালকেরা যেমন চন্দ্র সূর্য্যকে সোণা রূপার থালা বলিয়া বর্ণনা করে সেইরূপ অজ্ঞানী শাস্ত্রীদিগের নিকট ঈশ্বরের অবস্থা নিরূপিত হইয়া থাকে।

যদ্যপি প্রকৃত ধর্ম্ম প্রচার করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে অগ্রে যাহা প্রচারিত হইবে তাহা অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। ঈশ্বর-তত্ত্ব কি তাহা গ্রন্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া ঈশ্বরের নিকট হইতে লাভ করিবার জন্য যত্নবান হইলে যে কি অনির্ব্বচনীয় অমূল্য ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা এই পৃথিবীমণ্ডলে কুত্রাপি নাই। যে যে সম্প্রদায়ভুক্ত হউন, যাহার যে কোন প্রকার ভাব থাকুক, যিনি যে উপায় অবলম্বন করুণ ঈশ্বরের প্রতি মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া আপনার কল্যাণ কামনা এবং যাহাতে সেই সর্ব্বাধার পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ হয় তাহারই অনুষ্ঠান করিলে প্রকৃত ধর্ম্ম করা হইবে। অপরের ভ্রম সংশোধনের চেষ্টা করিতে যে সময়াতিবাহিত হইয়া যায়, তাহা ঈশ্বরের প্রতি অর্পিত হইলে যে লাভ হইবে না, এ কথা কে অস্বীকার করিবেন? মনুষ্য মনুষ্যের ভ্রম সংশোধন করিতে অপারক। তাহাতে বিবাদ উপস্থিত হইয়া থাকে।

অদ্যাপি কোন ব্যক্তি আপন দোষ স্বীকার করিলেন না। নিরাকার বাদীরা এত তিরস্কার করিতেছেন তথাপি একটী সাকার বাদীর ভ্রম সংস্কার করিতে পারিলেন না। খৃষ্টানেরা হিন্দুদের ধর্ম্ম একেবারে উড়াইয়া দিয়া কত কথাই বলিতেছেন। কিন্তু সে কথা কয়জন

গণনায় লইয়াছেন? ঈশ্বর যখন যাঁহার ভ্রম সংশোধন করেন, তখনই তাহা পরিশুদ্ধ হয়। তিনি সকলের কর্ত্তা। পরিত্রাণের ভার তাঁহার। মনুষ্যদিগের সেজন্য দায়ী হইতে হইবে না। আপনার কি হইবে তাঁহারই নির্ণয় হইল না, অপরের জন্য চিন্তিত হইলে হইবে কি? যিনি জগৎ পিতা, যিনি জগৎ কর্ত্তা, যিনি জগৎ প্রতিপালক তাঁহার কার্য্যের প্রতি আমরা কেন যে হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হই, তাহা বলিতে পারি না। আমাদের এইমাত্র কর্ত্তব্য বুঝিয়া থাকি যে যাঁহার দ্বারা পরিত্রাণ হইবে, তাঁহাকে কেহ যেন বিস্মৃত না হন্। তাঁহাতে লক্ষ্য করিয়া যাঁহার যাহা ইচ্ছা করুন। তাঁহার পাদ পদ্ম স্মরণ করিয়া যাঁহার যাহা অভিরুচি তাহা বলুন—অন্তর্য্যামী সর্ব্বব্যাপী হরি তাহা অবশ্যই জানিতে পারিবেন এবং তদনুযায়ী ফল প্রদান করিবেন ইহাতে কোন সংশয় নাই। এই প্রকার ধর্ম্ম প্রচারই প্রকৃত সনাতন ধর্ম্মের মর্ম্ম।

শরণাগত প্রতিপালন ধর্ম্ম।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ। আপনি সমুদয় শাস্ত্র পরিজ্ঞাত হইয়াছেন; অতএব শরণাগত ব্যক্তিরে প্রতিপালন করিলে যে মহান্ ধর্ম্ম লাভ হয়, তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ শরণাপন্ন ব্যক্তিকে রক্ষা করা অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। শিবি প্রভৃতি মহাত্মা মহীপালগণ শরণাগত ব্যক্তিদিগের রক্ষাবিধান পূর্ব্বক পরম গতি লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এক কপোত শরণাগত শত্রুর যথোচিত সৎকার করিয়া স্বীয় মাংস প্রদান পূর্ব্বক তাহার ক্ষুধাশান্তি করিয়াছিল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কপোত কিরূপে শরণাগত শত্রুকে স্বীয় মাংস প্রদান করিয়াছিল—তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! ভার্গব, মহারাজ মুচুকুন্দের নিকট ঐ সর্ব্বপাপ নাশিনী বিচিত্র কথা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে তুমি ঐ কথা শ্রবণ কর। একদা মহারাজ ভার্গবকে প্রণিপাত করিয়া তাঁহারে শরণাগত প্রতিপালকের ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, মহারাজ! তুমি অবহিত হইয়া এক ধর্ম্মার্থকামসম্বলিত অপূর্ব্ব ইতিহাস শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে এক পক্ষি-লুব্ধক পাপপরায়ণ ক্ষুদ্রাশয় নিষাদ কালান্তক যমের ন্যায় অরণ্য মধ্যে পর্য্যটন করিত। সেই দুরাত্মার শরীর কাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ, জঙ্ঘা সুদীর্ঘ, পদদ্বয় খর্ব্ব, মুখ প্রকাণ্ড ও জানুদেশ প্রশস্ত ছিল। ঐ পাপাত্মা ঘোরতর নিষ্ঠুরের ব্যবসায় অবলম্বন করাতে তাহার পত্নী ভিন্ন আর সমুদয় সুহৃৎ, সম্বন্ধী ও বন্ধু বান্ধব তাহারে পরিত্যাগ করিয়াছিল। জ্ঞানবান্ লোকে কদাপি পাপীদিগের সহিত সংস্রব রাখিতে বাসনা করেন না, কারণ যাহারা দুষ্কর্ম্ম দ্বারা আপনাদিগের অনিষ্ট সম্পাদন করে, তাহাদের দ্বারা অন্যের হিতসাধনের সম্ভাবনা কোথায়? হত্যাকারী নৃশংস নরাধমেরা সর্পের ন্যায় প্রাণিগণের উদ্বেগজনক হইয়া থাকে।

ঐ পাপাত্মা নিষাদ জাল গ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বদা বনে বনে ভ্রমণ ও পক্ষিগণের প্রাণ সংহার

করিয়া তাহাদিগকে বিক্রয় করিত। এইরূপে বহুকাল গত হইল কিন্তু সেই দুরাত্মা কোন ক্রমেই আপনার অসৎ প্রবৃত্তি নিবন্ধন অধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইতে পারিল না।

একদা সেই ব্যাধ অরণ্যে পর্য্যটন করিতেছে এমন সময়ে প্রবল বায়ুবেগ সমুত্থিত হইয়া পাদপগণকে উৎপাটিত প্রায় করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে নভোমণ্ডল অর্ণবযান-পরিপূর্ণ সাগরের ন্যায় মেঘজালে সমাচ্ছন্ন ও বিদ্যুন্মণ্ডলে বিভূষিত হইল। মুষলধারে অনবরত বারিধারা নিপতিত হওয়াতে বসুন্ধরা ক্ষণকাল মধ্যে প্লাবিত হইয়া গেল। ঐ সময় দুরাত্মা নিষাদ শীতার্ত্ত ও বিচেতন হইয়া আকুলিত চিত্তে বনমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল. কিন্তু সমুদয় অরণ্য জলাকীর্ণ হওয়াতে কুত্রাপি স্থান প্রাপ্ত হইল না। ঐ বৃষ্টির প্রভাবে বিহঙ্গমগণ নিহত ও তরুতলে নিপতিত হইয়াছিল এবং মৃগ, সিংহ ও বরাহগণ উন্নত ভূমি আশ্রয় করিয়া অবস্থান ও অন্যান্য বন্য জন্তুগণ ভয়ার্ত্ত ও শীতার্ত্ত হইয়া অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছিল। দুরাত্মা ব্যাধ সেই বাতবৃষ্টি প্রভাবে নিতান্ত শীতার্ত্ত হইয়া অন্য স্থানে প্রস্থান বা তথায় অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। সেই সময় এক শীত-বিহ্বলা কপোতী তাহার নেত্রগোচর হইল। দুরাত্মা নিষাদ তৎকালে স্বয়ং যার পর নাই কষ্টে নিপতিত হইয়াছিল, তথাপি সেই কপোতীরে ভূতলে নিপতিত দেখিবামাত্র স্বীয় পিঞ্জর মধ্যে নিক্ষেপ করিল। স্বয়ং দুঃখে অভিভূত হইয়াও সেই কপোতীরে সেই দুঃখে দুঃখিত করিতে তাহার কিছুমাত্র কষ্ট হইল না। অনন্তর সেই দুরাত্মা নিষাদ সেই অরণ্যজাত পাদপগণের মধ্যে এক মেঘশ্রেণী ন্যায় নীলবর্ণ বৃক্ষ অবলোকন করিল। ঐ পাদপের ছায়া ও ফল ভোগ করিবার নিমিত্ত অসংখ্য বিহঙ্গম উহাতে বাস করিত। বিধাতা পরোপকারের নিমিত্তই সাধুর ন্যায় ঐ তরুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে নভোমণ্ডল নির্ম্মল নক্ষত্রজালে মণ্ডিত হইয়া প্রফুল্ল কুমুদদল-শোভিত বিমল সরোবরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন সেই শীতবিহ্বল নিষাদ আকাশমণ্ডল মেঘনির্ম্মুক্ত, নক্ষত্রজালে সমাকীর্ণ দেখিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ মনে মনে চিন্তা করিল, এক্ষণে রজনী উপস্থিত হইয়াছে এবং আমার গৃহও এস্থান হইতে অনেক দূর। অতএব অদ্য এই তরুতলেই রজনী যাপন করা কর্ত্তব্য। পক্ষিঘাতক নিষাদ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বনস্পতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "তরুবর! তোমাতে যে সমস্ত দেবতা আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, আমি তাঁহাদের শরাপন্ন হইলাম।" নিষাদ এই কথা বলিয়া ভূতলে পর্ণশয্যা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক এক শিলার উপর মস্তক সংস্থাপন করিয়া দুঃখচিত্তে শয়ন করিল।

বৎস! ঐ বৃক্ষের শাখায় এক কপোত সুহৃজ্জনে পরিবৃত হইয়া বহুকাল বাস করিয়াছিল। ঐ দিবস প্রাতঃকালে তাহার প্রিয় বনিতা আহারান্বেষণে গমন করিয়াছিল। রজনী সমাগত হইল তথাপি প্রেয়সী প্রত্যাগত হইল না দেখিয়া পক্ষী অনুতাপ করতঃ কহিতে লাগিল "হায়! আমার প্রণয়নী কি নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত প্রত্যাগত হইল না। ইতিপূর্ব্বে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত ও ভয়ঙ্কর বারিধারা নিপতিত হইয়াছে। তন্নিবন্ধন এই কানন মধ্যে তাহার

ত অমঙ্গল উপস্থিত হয় নাই। আজি প্রিয়-বিরহে আমার এই গৃহ শূন্যময় বোধ হইতেছে গৃহস্থের গৃহ পুত্র পৌত্র, বধূ ও ভৃত্যগণে পরিপূর্ণ থাকিলেও ভার্য্যা বিরহে শূন্যপ্রায় হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা গৃহিণী-শূন্য গৃহকে গৃহ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না। গৃহিণীই গৃহ স্বরূপ কথিত হইয়া থাকে। গৃহিণীশূন্য গৃহ অরণ্য প্রায়। আজি যদি আমার সেই অরুণ নেত্রা বিচিত্রাঙ্গী মধুর ভাষিণী ভার্য্যা প্রত্যাগমন না করে, তাহা হইলে আমার জীবনে প্রয়োজন কি? আমার সেই প্রিয়তমা আমি অস্নাত ও অভুক্ত থাকিতে কদাপি স্নান ভোজন করে না। আমি উপবেশন করিলে উপবেশন ও শয়ন করিলে শয়ন করিত। আমার দুঃখে তাহার দুঃখ ও আমার পরিতোষেই তাহার পরিতোষ হইয়া থাকে। আমি বিদেশস্থ হইলে সে বিষণ্ণবদনে কাল হরণ ও আমি ক্রুদ্ধ হইলে আমার প্রতি প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করে। এই পৃথিবীতে যাঁহার ভার্য্যা এইরূপ পতিহিতৈষিণী ও পতিপরায়ণা, সেই ধন্য। আমার সেই স্থির স্বভাবা যশস্বিনী প্রিয়তমা আমারে ক্ষুধার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত জানিয়াও কেন এখন পর্য্যন্ত আগমন করিতেছে না। সস্ত্রীক ব্যক্তির বৃক্ষমূলও গৃহস্বরূপ ও ভার্য্যা বিহীন পুরুষের অট্টালিকাও অরণ্য তুল্য বোধ হয়,সন্দেহ নাই। ভার্য্যাই পুরুষের ধর্ম্মার্থ কাম সাধনের একমাত্র উপায় ও সহায় এবং বিদেশ গমন কালে একমাত্র বিশ্বাসের আধার হইয়া থাকে। ইহলোকে ভার্য্যার তুল্য পরম ধন আর কিছুই নাই। বনিতাই পুরুষের লোকযাত্রা সম্পাদন করিয়া থাকে। রোগাভিভূত আর্ত্ত ব্যক্তির ভার্য্যাই মহৌষধ। ভার্য্যার তুল্য পরম বন্ধু আর কেহই নাই। ধর্ম্মসংগ্রহ বিষয়ে ভার্য্যাই একমাত্র সহায় হইয়া থাকে। পতিব্রতা প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা যাহার গৃহে নাই তাহার অরণ্য গমন করাই কর্ত্তব্য। তাহার গৃহ ও অরণ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই

হে ধর্ম্মরাজ! দুরাত্মা নিষাদ ইতিপূর্ব্বে যে কপোতীকে স্বীয় পিঞ্জরে নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই কপোতই ঐ কপোতের পত্নী। কপোতী নিষাদের পিঞ্জর মধ্য হইতে ভর্ত্তার সেই করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিল, "আহা। আমি বস্তুতঃ গুণশালিনী হই বা না হই, আমার ভর্ত্তা যখন আমার গুণকীর্ত্তন করিতেছেন তখন আমার সৌভাগ্যের পরিসীমা নাই। স্বামী যে নারীর প্রতি সন্তুষ্ট না থাকেন, তাহাকে নারী বলিয়া নির্দ্দেশ করাও কর্ত্তব্য নহে। যে রমণী ভর্ত্তারে সন্তুষ্ট করিতে পারে সমুদয় দেবতা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন। অগ্নিরে সাক্ষী করিয়া পরিণয় কার্য্য নির্ব্বাহ হয় বলিয়া ভর্ত্তাই স্ত্রীদিগের পরম দেবতাস্বরূপ গণ্য হন। স্বামী যে নারীর প্রতি সন্তুষ্ট না হন। তাহাকে দাবাগ্নি দগ্ধ পুষ্পস্তবক-সমন্বিত লতার ন্যায় ভস্মীভূত হইতে হয়। পিঞ্জরস্থা কপোতবনিতা কিয়ৎক্ষণ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে স্থিরচিত্তে শোকাকুল ভর্ত্তারে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, নাথ! আমি এক্ষণে তোমাকে যে হিতকর বাক্য কহিতেছি, তাহা শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য! এই নিষাদ নিতান্ত শীতার্ত্ত ও ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া তোমার আবাসে সমুপস্থিত হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি তোমার শরণাগত, অতএব উহার রক্ষা বিধান ও সমুচিত সৎকার করা, তোমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। গোহত্যা ও ব্রহ্মহত্যায়

যে পাপ জন্মে, শরণাগত ব্যক্তিরে নষ্ট করিলেও সেই পাপ জন্মিয়া থাকে। আমরা কপোতকুলে জন্ম গ্রহণ নিবন্ধন স্বভাবতঃ হীনবল হইয়াছি বটে, তথাপি তোমার মত অন্যান্য তত্ত্বজ্ঞ প্রাণীর সাধ্যানুসারে শরণাগত প্রতিপালনে যত্ন করা কর্ত্তব্য। যে গৃহস্থ যথাশক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, পরলোকে সে অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে তুমি সন্তান-সন্ততির মুখাবলোকন করিয়াছ, অতএব দেহের মায়া পরিপরিত্যাগ পূর্ব্বক এই নিষাদকে পূজা দ্বারা পরিতুষ্ট কর। আমার নিমিত্ত আর অনুতাপ করিও না। তুমি জীবিত থাকিলে শরীর যাত্রা নির্ব্বাহার্থ অন্য পত্নী পরিগ্রহ করিতে পারিবে। পিঞ্জরস্থা কপোতপত্নী অতিশয় দুঃখার্ত্ত হইয়াও ভর্ত্তারে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে এইরূপ হিতোপদেশ প্রদান করিল।

মহারাজ! তখন সেই কপোত স্বীয় পত্নীর ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণে মহা আহ্লাদিত হইয়া বাষ্পাকুলনয়নে ব্যাধকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক পরম সমাদরে তাহার যথাবিধি পূজা করিল এবং স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল মহাশয়! এখানে আপনার কিছুমাত্র আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই, আপনি আপনার গৃহেই উপস্থিত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনার অভিপ্রায় কি এবং আমারেই বা আপনার কি কার্য্য করিতে হইবে তাহা শীঘ্র ব্যক্ত করুন। আপনি আমাদের গৃহে আসিয়াছেন, অতএব আপনার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। গৃহাগত শত্রু হইলেও অচিরাৎ তাহার সমুচিত সৎকার করা উচিৎ। লোকে বৃক্ষছেদনের নিমিত্ত গমন করিলেও বৃক্ষ কখন তাহাদের ছায়ানিবর্তনে বঞ্চিত করে না। অতএব অতিথি গৃহে আগমন করিলে যত্নপূর্ব্বক তাহার পূজা করা সকলেরই বিশেষতঃ পঞ্চযজ্ঞপ্রবৃত্ত গৃহস্থদিগের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে ব্যক্তি গৃহী হইয়া মোহবশতঃ পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করে, সে কি ইহলোক, কি পরলোক কুত্রাপি সদ্গতিলাভে সমর্থ হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে যাহা আপনার অভিলাষ থাকে, প্রকাশ করুন, আমি সাধ্যানুসারে তাহা সম্পাদন করিব। তখন নিষাদ কপোতের সেই সজ্জনোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, পরাবত! আমি শীতে নিতান্ত কাতর হইয়াছি অতএব যাহাতে আমার শীত নিবারণ হয়, তাহার উপায় বিধান করুন

লুব্ধক এই কথা কহিলে কপোত তৎক্ষণাৎ যত্নপূর্ব্বক ভূতলে শুষ্কপত্র সমুদয় একত্র করিয়া দ্রুত বেগে অগ্নি আহরণার্থ গমন করিল এবং অনতিবিলম্বে অঙ্গারশালা হইতে অগ্নি গ্রহণ পূর্ব্বক তথায় প্রত্যাগমন করিয়া পত্ররাশি প্রজ্বলিত হইলে কপোত নিষাদকে কহিল, মহাশয়। এক্ষণে নিরুদ্বেগে অগ্নি সন্তাপ দ্বারা শীত নিবারণ করুন। তখন ব্যাধ তাহার বচনানুসারে হুতাশনে স্বীয় গাত্র সন্তপ্ত করিতে লাগিল এবং অনতিবিলম্বে শীত নির্ম্মুক্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে ব্যাকুল নয়নে কপোতের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিল, বিহঙ্গম! আমি ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি; অতএব আমাকে কিঞ্চিৎ আহার প্রদান কর।

কপোত ব্যাধের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, মহাশয় আমার এমন কোন সঞ্চিত দ্রব্য নাই যে তদ্দ্বারা আপনার ক্ষুধা নিবারণ করি। ক্রমশ

শ্রীকালীচরণ কবিরত্ন।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রোগ-মুক্তি।—নারোজোলের স্বনাম ধন্য বদান্যবর রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র লাল খাঁন বাহাদুর জ্বর রোগে এত দিন শয্যাগত ছিলেন—সম্প্রতি শুনিয়া সুখী হইলাম, তিনি আরোগ্য লাভ করিয়া পুনরায় রাজ কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। রাজা নরেন্দ্র লাল আর্ত্তের সহায়—দরিদ্রের বন্ধু বিপন্নের বিপদ মোচনে তিনি মুক্তহস্ত, দেশের প্রায় অধিকাংশ জমীদার নাম কিনিবার জন্য দান করেন। পাত্রাপাত্র তাঁহারা তত দেখেন না। রাজা নরেন্দ্র লাল কিন্তু সেরূপ দানের পক্ষপাতী নহেন; সাত্ত্বিক ভাবে দান করা তাঁহার কুলোচিত ধর্ম্ম। তিনি স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া যেরূপ ত্যাগ স্বীকার করেন,তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এরূপ ন্যায়পরায়ণ ধর্ম্মভীরু, সরল প্রকৃতি নরপতি বাঙ্গালা দেশে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভগবান এরূপ সদ্ধর্ম্ম নিরত রাজাকে দীর্ঘজীবী করিয়া দেশের মঙ্গল বিধান করুন, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

—•—

স্বদেশী সেন সেন। আমরা সি, সি, মহাজন এণ্ড কোম্পানীর এক কৌটা স্বদেশী সেন সেন উপহার পাইয়াছি, ইহার গন্ধ অতি মনোহর, পানের সহিত চর্ব্বণ করিলে মুখে বেশ সুগন্ধ বাহির হয়। শ্লেষ্মা নিবারণে ইহার গুণ অশেষ, আমরা এই কোম্পানীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি। ১৭৭।২ নং হ্যারিসন রোড উক্ত কোম্পানীর নিকট পত্র লিখিলে সকলেই বিনামূল্যে ও বিনামাসুলে নমুনা স্বরূপ "সেন সেন" উপহার পাইবেন।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

আমাদের বৎসর শেষ হইল। ১৩১৮ সালে "আলোচনা" পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। আলোচনা হিন্দু সমাজের মুখ পত্র, ইহাতে প্রতি মাসে ধর্ম্ম বিষয়ক অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হয়; তাই আজ কাল বাজারে ইহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইয়াছে, আমরা যে এতাবৎ কাল আলোচনা পরিচালন করিয়া সাধারণের মনস্তুষ্টি করিতে পারিয়াছি, গ্রাহকগণ, যে ইহা পাঠে সন্তুষ্ট হইতেছেন, তাহা জানিতে পারিয়া আমরা সকলের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

উপহার।

বিনামূল্যে কাশীরাম দাসের মহাভারত নির্ভুল সংস্করণ সুন্দর বাঁধাই, ৪৫ খানি সুন্দর ছবি যুক্ত; যাহা বাজারে ২৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতেছে, এবার আমরা গ্রাহকগণকে তাহা উপহার দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি, এরূপ কখন হয় নাই, হইবার নহে। যিনি পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ১।৹ টাকা এবং পুস্তক পাঠাইবার খরচ বাবদে ॥৹ আনা অতিরিক্ত অর্থাৎ মোট ২৲ টাকা দিবেন, তিনিই পাইবেন। পুস্তক ২০০ শত মাত্র; বৈশাখ মাসের মধ্যে টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক না হইলে, আমরা আর কাহাকেও উপহার দিতে পারিব না। সকলে সত্বর হউন। বার্ষিক মূল্য ও উপহার পাঠাইবার খরচ অগ্রিম দেয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ।